পেত্রাস স্‌ভির্কা

ভ্রাতৃত্বের বীজ

তাঁর ছোটো জীবনের মধ্যে লিথুয়ানিয়ার লেখক প. স্ভির্কা (১৯০৯—১৯৪৭) সাহিত্যিক ও সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন তিনটি উপন্যাস। 'ফ্রাঙ্ক ক্রুক' (১৯৩৪) নামে উপন্যাসটি হলো লিথুয়ানিয়ার কৃষক উদ্বাস্তুদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে; 'মাতা বসুমতী' (১৯৩৫)—যে কুখ্যাত 'কৃষি সংশোধন' চাষীদের প্রতারণা করেছিলো সেটি চালু হবার পর লিথুয়ানিয়ার গ্রামের কথা; 'মিস্ত্রি ও তার ছেলেরা'—১৯০৫-এর বৈপ্লবিক ঘটনার বিষয়। তাঁর অসংখ্য গল্পগুলি বিভিন্ন বছরে প্রকাশিত হয়েছিলো।

স্ভির্কা গভীরভাবে ভালোবাসতেন তাঁর স্বপ্নময় সবুজ

দেশকে। তাঁর সহজ গল্পগুলোয় তিনি লিথুয়ানিয়ার চাষীদের শত্রু এবং বন্ধুদের সাহসের সঙ্গে দেখিয়েছিলেন।

লিথুয়ানিয়ার লেখক পেত্রাস স্‌ভির্কা'র গল্পের এই ছোট্টো বইয়ের দু'খণ্ডে লিথুয়ানিয়ার জনগণের জীবনের দু'টি অবস্থা প্রতিবিম্বিত হয়েছে: প্রথম খণ্ড হলো 'ভ্রাতৃত্বের বীজ', তাতে বর্ণিত হয়েছে সোভিয়েত লিথুয়ানিয়ার বাস্তব অবস্থার কথা। এর মধ্যে রয়েছে ফাসিস্ট অধিকারের দুর্বৎসরগুলি। দ্বিতীয় খণ্ড হলো 'অতীতের একটি পৃষ্ঠা'। তাতে রয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া লিথুয়ানিয়ার জীবনযাত্রার কথা।

সোভিয়েত ছোটো গল্প সিরিজ

পেত্রাস স্ভির্কা

ভ্রাতৃত্বের বীজ

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

অনুবাদ: রেখা চট্টোপাধ্যায়

চিত্রাঙ্কন,

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা:

গ. জাভিয়ালভা

সূচীপত্র

ভ্রাতৃত্বের বীজ

	পৃষ্ঠা
ভ্রাতৃত্বের বীজ	৭
মিকুটিসের বিপদ	২৭
গোপন খবর	৬০
প্রতিনিধি	৭৯
গান	৯৮

অতীতের একটি পৃষ্ঠা

সুপারফসফেট	১২৩
খরগোস	১৪২
আমার বাবা	১৬৫
অতীতের একটি পৃষ্ঠা	১৮৭

প্রাতৃত্বের বীজ

ভ্রাতৃত্বের বীজ

এখনো আমার মনে অদূর অতীতের নানা ছবি ভিড় করে আসে। ১৯৪১ সালের সেই রাত্রে আকাশ থেকে বোমা বর্ষণের আশঙ্কায় নানা মুখের এবং নানা বাড়ীর বিষণ্ণ ছবি রাত্রির দিকে তাকিয়ে আছে; স্মলেন্স্ক'এর পথের ধূলোয়

হাজার হাজার লোকের চোখের পাতাগুলো ধূসর; আর বুকের কাছে জেগে ওঠা ছেলেরা এই প্রথমবার তাদের পালিয়ে যাওয়া মা'দের ঘাড়ের পেছনে তাকিয়ে দেখলো লড়াই'এর কালো ধোঁয়া।

নদীর গভীরে পোঁতা পুরোণো এক সেতুর খুঁটিগুলোর মতো আমি কাঁপতে লাগলাম নীচে দিয়ে চলে যাওয়া ঢেউগুলো এবং উপর দিয়ে চলে যাওয়া অসংখ্য পদাতিকের পদধ্বনিতে। বেলাভূমিতে ভেঙে পড়া ঢেউ'এর মতো আমার হৃদয়ে নানা স্মৃতি আছড়ে পড়লো—নানা ছবি এবং নানা দৃশ্য জাগিয়ে তুলে।

যখনি আমি কোনো বই খুলে বসি কিম্বা বসন্তের পরিষ্কার আকাশে তারার দিকে তাকাই কিম্বা কোনো দূরের ট্রেনের শব্দ শুনি—সর্বদাই আমার তখন মনে হয় যে জীবনের এই সমস্ত আনন্দের দাম আমার অনেক ভাইকে নানা কষ্ট এবং অনেক লড়াই'এর বিনিময়ে কিনতে হয়েছে। গানের ভাষা এবং ভস্মীভূত গ্রামের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একটি আপেল গাছের ফুল সেই সমস্ত সংখ্যাহীন বাহু ও হৃদয়ের সাহস এবং শক্তির কথা বলে চলে—বহুকাল হোলো যারা নিস্তব্ধ হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। যে সব মানুষদের আমি কখনো দেখিনি তাদের উপস্থিতি অনুভব করি—যারা

স্তালিনগ্রাদের দেয়ালের পাশে এবং দ্‌নেপ্র্‌ ও নেমান নদীর তীরে মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন।

শরতের এক দিনে আমার দেশের মাঠ পার হবার সময় এক বিধ্বস্ত গ্রামের বাইরে আমি একটি বুড়ো লোক এবং একটি ছেলেকে দেখলাম। একটা অকেজো জার্মান ট্যাঙ্কের মসীলিপ্ত পাশগুলোকে আরো কালো করে মাটির পাত্রে তারা আগুন জ্বালাচ্ছিল। একমুহূর্তের জন্যে আমি বুঝতে পারলাম না এসবের মানে কী। কিন্তু যখন কাছে এলাম দেখলাম বুড়ো লোকটি ট্যাঙ্ক থেকে এক ঝাঁক মৌমাছি ধোঁয়া দিয়ে তাড়াচ্ছে। মৌমাছিগুলো গ্রীষ্মকালে তার মধ্যে বাসা বেঁধে প্রচুর মধু জমিয়েছিল। কাছেই ছিল নতুন একটা মৌচাক।

প্রত্যহই আমি দেখি নতুন মৌমাছির ঝাঁক আর নতুন চারা—যেখানে এই সেদিনও মৃত্যুরই রাজত্ব ছিল। আর আমার হৃদয় তাদের প্রতি অনন্ত কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে যারা আমাকে আজকের এবং আগামী দিনের আলো দিয়েছে—সেই আলো যার আভায় আমার দেশের ভবিষ্যৎকে দেখতে পাই।

গ্রীষ্মের সেই সমস্ত শান্ত সন্ধ্যায় যখন নেমান'এর উপত্যকায় গোধূলির গাঢ় ছায়া নেমে আসে আর যখন

দিনের কর্মকোলাহল স্তব্ধ হয়ে যায়, আমি তখন শুনতে পাই মাঠের মধ্যে খুঁটি পোঁতবার একঘেয়ে ভোঁতা আওয়াজ। একটা জলপক্ষী কর্কশ সুরে গান গায়, শুক্‌নো আর কটকটে তার স্বর—কিন্তু শীঘ্রই তার স্বরও থেমে যায়। কী নিস্তব্ধতা। যেন উত্তাপে হাঁপানো পৃথিবীর নিঃশ্বেস আর নদীর বালির তলায় মাছদের কান্‌কো দিয়ে খস্‌খস্‌ করে এগিয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়। এ-সমস্তই কিন্তু প্রতিদিনকার শব্দে অভ্যস্ত কাণের মায়া-মরীচিকা। কিন্তু মন দিয়ে শুন্‌লে শুনতে পাবে গঙ্গাফড়িং'এর বিরামহীন কর্কশ শব্দ, পুরু ঘাসে তাদের ছোট ছোট বেহালা বাজাবার খস্‌খস্‌ আওয়াজ। কোনো ডাল থেকে তাজা একটি শিশির বিন্দু গড়িয়ে পড়লো আর গালের ওপর দিয়ে সেটি গড়িয়ে পড়ার সময় তার স্নিগ্ধতা আমি অনুভব করলাম। এই শিশির বিন্দুর জন্য, গ্রীষ্মের এই শান্ত সন্ধ্যার জন্য, মহৎ কিছু করবার আকাঙ্খার জন্য সেই অজানা সৈনিককে আমার ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু এখন সে কোথায়?

মাত্র একবার তাকে দেখেছিলাম, দ্রুত ধাবমান এক মুহূর্তে, কিন্তু কখনোই তার মুখ আমি ভুলবো না।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৪১'এর গ্রীষ্মকালে ভেলিকিয়ে লুকি'তে। গত বেশ কয়েকদিন ধরে গ্রামে যাবার সমস্ত

পথগুলো ভরে ছিল হাজার হাজার উদ্বাস্তুদের ভিড়ে। তারা পালাচ্ছিল সাইকেলে, অসম্ভব বোঝাই ট্রাকে এবং হেঁটে। পালাচ্ছিল হিটলারের আক্রমণকারী সৈন্যদের অত্যাচার থেকে। ধূলি-ধূসর আর ক্লান্ত, ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত পা নিয়ে অনেক শো মাইল ইতিমধ্যেই তারা পেরিয়ে এসেছে। অনেক রাত কাটিয়েছে খড়ের গাদায় শেষহীন বোমা-বর্ষণের হয়রানিতে, নিজেদের প্রিয়জনদের থেকে বিছিন্ন হয়ে। হয়তো মা হারিয়েছেন তার ছেলেকে, স্বামী তার স্ত্রীকে। এখন তারা ভিড় করেছে বড় রেল ইস্টিশানে। মালগাড়ীতে তারা বসে রয়েছে। তাদের মনে আরামের কোনো চিন্তাই নেই। তারা ধীরভাবে ট্রেনগুলোর যাত্রার অপেক্ষা করছে।

রুশ, লিথুয়ানিয়ান, বেলোরুশিয়ান, লাত্‌ভিয়ান—সবাই মিলে এক বড় সংসার এইখানে। পুরুষ এবং স্ত্রী, বুড়ো এবং শিশু—সবাইকার উপরেই ঘনিয়ে উঠেছে একই ধরণের বিপদ। শুক্‌নো ঠোঁট নেড়ে শত্রুকে তারা অভিসম্পাত জানাচ্ছে আর অস্বস্তি নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে যেখান থেকে যে কোনো মিনিটে মৃত্যু আসতে পারে। মাত্র কয়েক দিনের ঘটনাই এদের অনেক শিখিয়েছে। বোমা বর্ষণের সঙ্কেত-ধ্বনিতে এরা আর আতঙ্কিত হয়ে পড়ে না। মায়েরা শুধু তাদের সন্তানদের বুকে চেপে ধরে আর

যুবকরা মুঠোর মধ্যে জোরে চেপে ধরে তাদের প্রেমিকাদের হাত। এই ইস্টিশানে এতো লোক ইতিপূর্বে কখনোই ভিড় করে আসেনি কিম্বা এতো গোলমাল আর এতো কষ্টের কান্না শোনেনি। কামরার ছায়ায় বিরাট এক তাঁবু পড়েছে যেন। সবাই কেৎলি আর বোতলে জল নিয়ে আসছে, দাড়ি কামাচ্ছে, নোংরা কাপড় ধুচ্ছে, নিজেদের কষ্টের কথা বলছে। তারা আগামী দিনে আরাম খুঁজে পেতে চায় আর মস্কো আর ভল্‌গার কথা আশান্বিত হয়ে বলে।

সৈনিকবাহী ট্রেনগুলো নতুন যোগ-দেওয়া সৈনিকদের নিয়ে চলে যায়, তাদের ছোট করে ছাঁটা চুল এখনো তামাটে হয়নি। তাদের তামাটে মুখের তুলনায় সেগুলোর রঙ অনেক ফিকে। সহজেই তাদের চেনা যায়। তাদের ঘোড়ার জন্য গাড়ী, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের রান্নাঘর আর ছদ্মবেশী-কামান নিয়ে এই সব সামরিক ট্রেনগুলি পশ্চিমের দিকে ছুটে চলেছে অবিরাম গতিতে। যে-সব ডালপালাগুলো কামানের মুখগুলোকে ঢেকেছিল ইতিমধ্যেই সেগুলো প্রখর সূর্যের তাপে কুঁকড়ে এসেছে যদিও সেগুলো গতকালই অরণ্যের ছায়ায় হিল্লোলিত ছিল। এই ডালপালাগুলোর ভাগ্যের সঙ্গে সৈনিকদের ভাগ্যের নিকট-সাদৃশ্য আছে: কচি আর সুন্দর আর কমনীয় ডালপালারা এখন এক বজ্র

বিদ্যুতের ঝড়ের মধ্যে আটকা পড়েছে। তারা রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত আসন্ন কালো মেঘের বিরুদ্ধে, অরণ্যের মত ঘন কালো যারা।

অধিকাংশই তারা ছিল যুবক। তাদের কোমরবন্ধগুলো এতো নতুন যে কিচ্ কিচ্ আওয়াজ করছিল। তারা অতি পরিচ্ছন্ন সামরিক পোষাক পরেছিল, যেগুলো দু'একদিনের মধ্যেই কর্দমাক্ত—এমন কি রক্ত-সিক্তও হয়ে উঠবে। তাদের ইস্কুলের বেঞ্চি কিম্বা মাঠ, কিম্বা কাজের জায়গা থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল—রুশ, কাজাখ এবং বেলোরুশিয়ান—যারা মিলিত হয়েছিল সেই একই কর্তব্য এবং সামরিক ভ্রাতৃত্বের বোধে, যেটা তাদের পূর্ব পুরুষদের উদ্বুদ্ধ করেছিল লড়তে, লেনিন যে সত্য তাদের কাছে এনেছিলেন তারই অনুপ্রেরণায়। আর এই ভয়ঙ্কর প্রহরে তাদের কপালের উপর আমি দেখলাম প্রত্যূষের জ্যোতি।

তাদের কেউ কেউ দরজা জুড়ে দাঁড়ালো, তাদের পেছনে অন্যরা তাস খেলছিল কিম্বা অ্যাকর্ডিয়ন সহযোগে গান গাইছিল। এদের নীরব দৃষ্টিতে উদ্বাস্তুপূর্ণ ট্রেনের মানুষের উপর কোনো অলস কৌতূহল ছিল না; ছিল না ট্রেন বোঝাই সেই দুঃখ-বেদনায়। শুধু এক শক্তির অনুভূতি তাদের ছিল—এই অসহায় উদ্বাস্তুদের উপর একজাতের আত্মগর্ব—

যারা পালিয়ে চলেছে পেছনে। সামরিক লাল পতাকাগুলো, যেগুলো সযত্নে ভাঁজ করে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সেগুলো অপেক্ষা করছিল সৈনিকদের বীরত্ব-ব্যঞ্জক প্রহরের জন্য। কিন্তু সেকথা সেই মুহূর্তে সৈনিকদের মনে ছিল না। তাদের ট্রেন থামতে না থামতেই আবার চলতে সুরু করেছিল। নিয়ে চলেছিল হাসি আর তাজা মুখ—ঘামে চক্‌চকে। উদ্বাস্তুদের ভিড়ের মধ্যে মায়েরা ভরে রাখলেন তাঁদের মনে সেইসব তরুণ সৈনিকদের ক্ষণস্থায়ী ছবিগুলি।

ইতিমধ্যেই অনেক ঘণ্টা ধরে আমরা ইস্টিশানে এসেছি, রেলের পথ পরিষ্কারের অপেক্ষায় আছি। ট্রেনটা শীঘ্রই চলতে সুরু করবে—এই গুজবে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল; লোকজন ছুটলো তাদের কামরার দিকে, জল ছড়িয়ে আর অভুক্ত খাবারগুলোকে জড়াতে জড়াতে।

সেই মুহূর্তে আমাদের কামরার একটি মহিলা তাঁর সন্তানকে খুঁজে পেলেন না। ছেলেটা কামরার মধ্যেও নেই, লাইনের কাছেও নেই—যেখানে কয়েক মুহূর্ত আগেও সবাই আমরা তাকে দেখেছিলাম। কামরা থেকে কামরায় তিনি দৌড়ুতে লাগলেন, ওপর নীচ সব জায়গা দেখলেন, ছেলেটার নাম ধরে চিৎকার করলেন আর প্রশ্ন করে চললেন কেউ তাকে দেখেছে কিনা। ব্যস্ত জনতা তাকে ধূলি কণার মত

ঝেঁটিয়ে ফেলেছে। হয়তো সে পরের কামরাতেই রয়েছে কিম্বা কোথাও এক সস্তা খেলনা দেখে নিঃশব্দে খেলতে বসে গেছে। আরো একটি সম্ভাবনা এই যে সে কামরার মধ্যেই হয়ত রয়েছে, মাল-পত্রের কিম্বা মানুষের ভিড়ে।

একজন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লো, 'ওতো আর ছুঁচ নয়, ওকে তুমি খুঁজে পাবেই।'

আরেকজন বল্‌লো, 'কিন্তু এইমাত্র তাকে আমি দেখেছি; সবুজ টুপি-পরা একটি ছেলে।'

'তাকে নিয়ে কেউ পালাবে না। তাকে খুঁজে পাওয়া যাবেই।'

'তোমরা তো সহজেই বলতে পারো তাকে খুঁজে পাওয়া যাবেই। কিন্তু নিতান্তই সে শিশু আর কথা বলতেও জানে না।'

আমাদের ট্রেনের পাশেই সেই মা ছেলের নাম ধরে চিৎকার করতে করতে আর লিথুয়ানিয়ান এবং ভাঙা রুশ ভাষার মিশ্রণে কিছু প্রশ্ন করতে করতে দৌড়ে চলে গেলেন।

লাইন ধরে তিনি দৌড়োতে লাগলেন, এক ট্রেন থেকে আরেক ট্রেনে, বারবার একই কামরায় চাইতে চাইতে আর সেই সব লোকদেরই থামিয়ে প্রশ্ন করতে করতে ইতিপূর্বেই

যাঁদের তিনি তাঁর সন্তানের কথা জিগ্গেস করেছিলেন। পায়ে তাঁর ক্যাম্বিসের গোড়ালি ক্ষয়ে যাওয়া জুতো; এক পাটি জুতো ঢল হয়ে খুলে খুলে পড়ছে—এসব দেখে ভারি অস্বস্তি হয়।

আর একটি সামরিক ট্রেন আমাদের পাশের লাইনে এসে পড়ল, আর এ্যালুমিনিয়ামের পাত্র হাতে নিয়ে, ট্রেনটার চলন্ত অবস্থাতেই সৈনিকরা লাফিয়ে লাফিয়ে পড়তে লাগলো।

আদেশের তীব্র সুরে এক অফিসার বল্লেন, 'খবর্দার, ছড়িয়ে পড়া চলবে না!' যে সব সৈন্যরা ইতিমধ্যেই কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েছিল তারা ফিরে এলো।

অফিসারের কাঁধটা ছিল কামরার দরজার কাঠামোয়; দৃষ্টি রোধকারী বার্চ গাছের একটা ডালকে তিনি সরিয়ে দিলেন। লড়াই অনেক দূরে এবং সূর্য নির্দয় উষ্ণ হওয়া সত্ত্বেও মাথার পেছনে তিনি হেলমেট পরেছিলেন। দীর্ঘ আর মজবুত তাঁর চেহারা, এমন জাতের লোক, এক ঝলকেই যাঁর সৌন্দর্য তারিফ করতে হয়। সরল আর স্বচ্ছ রুশ সৌন্দর্যের প্রতীক—যার সৌন্দর্যে মানুষমাত্রেই প্রথম দৃষ্টিতেই আকৃষ্ট হয় এবং কামনা করে। একথাটা আমিই কেবল অনুভব করিনি। আমার প্রতিবেশীদের দৃষ্টিও সেই অফিসারের উপর

নিবদ্ধ হয়েছিল, এবং কে একজন বলে উঠলো: 'মেয়েরা চেয়ে দেখ, কেমন এক চমৎকার চেহারার অফিসার!'

সৈনিকদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পর তাদের প্রতি আর কোনো মনোযোগ তিনি দিলেন না। দরজার কাঠামোয় হেলান দিয়ে এবং যে সব ঘাম তাঁর কপালে জমেছিল সেগুলোকে বড় বড় ফোঁটায় তাঁর মুখের ওপর ঝরতে দিয়ে গভীর চিন্তিত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। তাঁর কয়েকজন সহকর্মী তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ালো। তারাও সবাই আমাদের দিকে তাকাতে লাগলো। তাঁর হেলমেটে টোকা দিয়ে তাদের একজন কি একটা বললো, আর তারপর হাসিতে ফেটে পড়ে সেই গাড়ীর ভিতরে ফিরে গেল যেখানে কয়েকজন লোক বাক্স-গুলোকে টেবিল হিসেবে ব্যবহার করে খাবার খাচ্ছিল। কিন্তু অফিসারটি ঠাট্টা-তামাসাগুলো উপেক্ষা করলেন। তাঁর সামনে শুয়ে এবং বসে থাকা আমাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রইলো—সেই সব অনেক বিচিত্র মুখের উপর, যেখানে বহু গভীর দুঃখ-কষ্টের ছাপ আঁকা রয়েছে।

দুটি মেয়ে, হয়তো তারা আপন বোন, আমার পাশে একটি স্যুটকেশে বসে একসঙ্গে মাথা নুইয়ে মৃদু স্বরে গুণ-গুণ করতে লাগলো। সাধারণত আনন্দের দিনে সেই গান কোনো

রেখাপাত করতো না, কিন্তু আজ কথা না থাকলেও সেই গান হৃদয়কে স্পর্শ করলো এবং সেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গভীর এক চেতনাকে জাগিয়ে তুললো। যে শত্রু আমাদের আনন্দের উপর চড়াও করেছে তার ওপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর করলো। শ্রোতারা চুপ করে গেল, মনে হলো তারা যেন ভয় পেয়েছে এই মৃদু সুর, পাতলা এক সূতোর মতো, হঠাৎ হয়তো ছিঁড়ে যেতে পারে।

যে মেয়েটি তার সন্তানকে হারিয়েছিল সে ফিরে এলো এবং কামরার মধ্যেকার কে একজন আনন্দে চিৎকার করে উঠলো:

'ও খুঁজে পেয়েছে, ও খুঁজে পেয়েছে তার ছোট্ট সবুজ টুপিটিকে।'

মা আর দৌড়োচ্ছিলেন না, ব্যস্ততাও দেখাচ্ছিলেন না। ক্লান্ত হয়ে টলতে টলতে খালি পায়ে তাঁর সবুজ টুপি-পরা ছোট্ট ছেলেটিকে তিনি কোলে করে আনছিলেন। আমাদের কামরার কাছে পৌঁছবার পর গোটা দশ হাত প্রথমে ছেলেটিকে এবং তারপর তাঁকে উঠতে সাহায্য করলো। সবচেয়ে ভালো জায়গা দেওয়া হলো তাঁকে। এতই তিনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন যে চতুর্দিক থেকে আসা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি পারছিলেন না। যখন তিনি দেখলেন

তাঁর ছোট্ট ছেলেটিকে কোলে কোলে ঘুরতে নিজেকে তিনি আর সামলাতে পারলেন না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

অফিসারটির চিন্তিত দৃষ্টি তখনো আমাদের ওপর নিবদ্ধ ছিল। তাঁর সেই বিষণ্ণ দৃষ্টিতে প্রথম আমি দেখলাম এবং হৃদয়ঙ্গম করলাম দুঃখ এবং বেদনার গভীরতাকে, যেখানে শত্রুরা আমাদের দেশকে নিমজ্জিত করেছে।

সৈন্যবাহী ট্রেনের কামরাগুলো দুলে উঠে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেলো আর তারপর সামনে গড়িয়ে চললো। অফিসারটি হাতও তুললেন না কিম্বা তাঁর অন্যান্য সহ-কর্মীদের মত আমাদের বিদায় অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরও দিলেন না। মেয়েদের মধ্যে একজন একতাড়া মেঠো ফুল তাঁকে ছুঁড়ে দিলো। সেগুলো ছড়িয়ে পড়লো, মাত্র দু'একটি ছোট ফুল পড়লো তাঁর হেলমেটের উপর। তবুও তিনি নড়লেন না, আর মনে হোলো এই কথাগুলো বলার সময় তিনি যেন আরো দীর্ঘ হয়ে উঠেছেন:

'ভাই সব, শোক কোরো না। রাশিয়া-মা সবাইকার থাকবার জায়গাই দেবে।'

দ্রুত থেকে দ্রুততর হোলো ট্রেনের গতি। মনে হোলো কামরাগুলো বুঝি পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাবে। মুখ হাত এবং হাসি দ্রুত চলে যেতে লাগলো। একটি অ্যাকর্ডিয়ন

উঠলো বেজে আর শোনা গেল তাজা কণ্ঠের আনন্দিত গুঞ্জন। তারপর সব কিছু ডুবে গেল চাকার শব্দে। শেষ কামরাটা দুলতে দুলতে শব্দ করে চলে গেল। ফাঁকা রেল লাইনের উপর সূর্য ঝল্‌সাতে লাগলো।

* * *

সেই মহান স্বদেশ-প্রেমের লড়াই'এর অনেক দিন আর অনেক মাস, তারপর বছরের পর বছর দ্রুত তালে গেছে কেটে। ১৯৪১'এর সেই গুমোট গ্রীষ্মে যেসব সোভিয়েত সৈনিকরা যুদ্ধ ক্ষেত্রের পুরোভাগে দৌড়ে গিয়েছিল তারাই মস্কো আর স্তালিনগ্রাদের কাছে তাদের রেশমী বিজয় পতাকাগুলো বাতাসে ওড়ালো।

রাশিয়া-মা বহুকাল ধরে আমাদের আড়াল করে রেখেছিলেন। সবাই সেখানে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম—রেল ইস্টিশানে যে বোনেরা তাদের দেশের গান গেয়েছিল আর সেই মা ও তার ছোট্ট সবুজ টুপি-পরা সন্তান যাকে একদিন ভিড়ের মধ্যে সে হারিয়েছিল। আমার বিরাট মাতৃভূমির হৃদয়কে আমি চিনলাম—ভল্‌গা নদীর প্রফুল্ল ঢেউয়ের মধ্যে, কাজাখ দেশের স্তেপের উদার প্রান্তরে এবং সারাতভ'এর বৃদ্ধা মহিলার রেখাঙ্কিত মুখে।

কেবল মাঝে মাঝে—যখন আমি কাজ করছি কিম্বা দেশ

ভ্রমণ করছি, যখন আমি খবরের কাগজে পড়ছি সোভিয়েত সৈন্যের নতুন বিজয়ের কথা কিম্বা দেখছি সহরের আব্ছা পথে সৈন্যদের মার্চ করে যেতে—ভেলিকিয়ে লুকি'তে দেখা সৈনিকের মুখ আমার মনে পড়ে যায়, আর মনে পড়ে তাঁর বিদায়কালীন কথাগুলি। তাঁকে আমি খুব স্পষ্টভাবেই দেখতে পাই: কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম আর তাঁর স্টিল হেলমেটের ধূসর প্রভা। কখনো কখনো তাঁর ছবি আচম্‌কা ভেসে ওঠে, হঠাৎ ভেঙে দেয় আমার স্বাভাবিক চিন্তাস্রোতকে। আর আমি অন্যমনস্কভাবেই মনে মনে এঁকে চলি তাঁর ভবিতব্য এবং তাঁর অসমসাহসিক কার্যাবলীকে। মনে মনে তাঁর ছবি আমি আঁকি যেন তিনি তাঁর দলকে এক তুষার-ঝড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন কিম্বা রাত্রে কম্পিত দীপ শিখায় আলোকিত কোনো পরিখায় বসে এক রুদ্ধশ্বাস এবং উত্তেজিত হরকরার বর্ণনা শুনছেন। কখনো কখনো তাঁকে আমি দেখতে পাই কোনো এক পরিখার পাশে তাঁর ক্লান্ত মাথাটা হেলিয়ে বিশ্রাম নিতে—তাঁর হেলমেট ধুয়ে দিচ্ছে শরতের জোর বৃষ্টি।

এখন তিনি কোথায়? তাঁর ভাগ্যে কী ঘটেছে?

তিনি যে সান্ত্বনার কথা তখন আমাদের শুনিয়েছিলেন অনেকেই হয়তো সেই কথাগুলি বলতে পারতো আর সেই

কথাগুলি মন থেকে অনেক আগেই পারতো মুছে যেতে। কিন্তু প্রায়ই সেই কথাগুলি আমি ভাবি।

জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন এ-পর্যন্ত মন-না-দেওয়া মানেগুলি এবং নানা ঘটনা, কাজ ও কথার মহান রূপ ভাঁটায় দৃশ্যমান সমুদ্রের বেলার মত উন্মুক্ত হয়ে ওঠে। হয়তো এ-রকমই কোনো এক মুহূর্তে সমস্ত দেশ যে যন্ত্রণা অনুভব করছিল এবং তার ভাগ্যে কী আছে—আমরা পৃথিবীর মধ্যে যে-সব জিনিসকে সবচেয়ে প্রিয় মনে করি তার কপালেই বা কী আছে—এইসব ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছিল, তখন আমার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল এবং সেই সৈনিকের কথাগুলি গভীর রেখাপাত করেছিল। সহজ সেই কথা, কিন্তু এমন একটি মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল যে লিথুয়ানিয়ান কিম্বা ল্যাটভিয়ানদের কাছে অপরিচিত।

'ভাই সব, শোক কোরো না। রাশিয়া-মা সবাইকার থাকবার জায়গাই দেবে।'

যখনি আমি কোনো একটা বই খুলে বসি কিম্বা বসন্তের পরিষ্কার আকাশে তারার দিকে তাকাই আমি ধন্যবাদ জানাই তোমাকে, হে অজানা রুশ সৈনিক! সব কিছুর জন্যেই তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

কোথায় তুমি আজ?

মে দিবসের কুচকাওয়াজে তোমায় আমি ভুলতে পারি না, ভুলতে পারি না সৈন্য বাহিনীরা যখন পা মিলিয়ে চলে যায়। যে মুহূর্তে স্টিল হেলমেটের ঔজ্জ্বল্য আমি দেখি আমার চোখ তোমায় খুঁজে বেড়ায়—আর হাজার হাজার মুখের মধ্যে তোমাকে আমি চিনি।

* * *

খুব সম্প্রতি প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের নির্বাচনে পূর্ব লিথুয়ানিয়ায় আমাকে যেতে হয়েছিল। খুব আনন্দ হলো যখন আমি একটি গ্রামের পথে এসে পৌঁছুলাম—দুপাশে তার নতুন কুটীরের সারি। বেড়ার পাশে বায়ু তাড়িত তুষারের মাঝখান দিয়ে সরু আর গভীর একটি পথ রয়েছে। খড় ছড়ানো তুষারের উপর স্লেজ যাবার চিহ্ন আঁকা। পাতলা নীল গ্রাম্য ধোঁয়া পরিষ্কার আকাশে উঠছে আর কাছেই রয়েছে একটি অরণ্য, এতো অন্ধকার যে দেওয়াল বলে মনে হয়। এটা নতুন গ্রাম, মহান স্বদেশ-প্রেমের লড়াই'এর পর তৈরী হয়েছে সেই জমির ওপর যেটা আগে জমিদারদের ছিল।

নির্বাচনের আগের সভায় যে ইস্কুলে চাষীদের জমায়েত হবার কথা সেটা এক পুরোণো বড় বাড়ীর অন্তর্গত। তাদের পড়ার ঘরকে সাজাবার জন্যে কিছু ছেলেমেয়ে

ছুটির পর শিক্ষকের সঙ্গে থেকে গেছে; তাদের আনন্দিত স্বর আর হাতুড়ির শব্দে ইস্কুল বাড়ীটি মুখর। ছবিগুলি থেকে যেন বন্ধুত্বের জ্যোতি বেরুচ্ছে। সেগুলি বহু যত্নে কাটা হয়েছিল মাসিক পত্রিকার পাতা থেকে এবং রঙিন কাগজে ঝড়ীতে তৈরী ফ্রেমে এঁটে সেগুলো টাঙানো হয়েছিল দেয়ালে—ক্রেমলিনের নানা মিনার, কুবান মাঠের নানা ট্র্যাক্টর আর কুকুর-টানা স্লেজে একটি ইয়াকুত। তাল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা একটি নিগ্রো ছেলের রেখাচিত্র ছবিগুলির পাশে রয়েছে। রেখাচিত্রটি এঁকেছে একটি অপটু ছেলে। সেই কিশোর শিল্পী ছবিটির নীচে যে গল্প দিয়েছে সেটি খবরের কাগজে পড়া হালের একটি খবরের কথা আমায় মনে করিয়ে দিলো। উইলিয়াম স্মিথ নামে সান-ফ্রান্সিকোর একটি নিগ্রো বাদক বর্ণনা করেছিল কী করে শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকরা তার পিতাকে ফাঁসি দিয়েছিল, তার অপরাধ শুধু নিগ্রো বলে। সর্বত্রই স্মিথকে তারা তাড়া করতো আর ডাকতো কালা কুত্তা বলে। একদিন যখন সে অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে বাজাচ্ছিল এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন: 'দূর হ', তুই কালা কুত্তা!'

বোতল আর পিরিচ তার ওপর বর্ষা-ধারার মতো পড়তে লাগলো। কেটে গেল তার মুখ। অবশেষে তাকে

অবধারিত লিঞ্চিঙ্‌'এর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে দৌড়ে পালাতে হলো। স্মিথ তার বাঁশীকে বাক্স বন্দী করে চিরকালের মত আমেরিকা ত্যাগ করলো। সে দেশকে সে ভালোবাসতো, কিন্তু সেখানে সে ছিল কেবল একটি কালা কুত্তা। সোভিয়েত দেশে সে এলো আর সে জানতো সেখানে কেউ তাকে অপমান করবে না।

এ গল্পটির তলায় (স্পষ্টত এই গল্প কাগজ থেকে নেওয়া হয়েছে) বড় বড় হরফে লেখা: 'পৃথিবীর সমস্ত জাত-ই ভাই-ভাই। সোভিয়েত ইউনিয়ন নিগ্রোদের আশ্রয় দেয়।'

আমি যখন এই গল্প পড়ছিলাম ছেলের দল নিঃশব্দে আমাকে দেখছিল।

'ছবিটা এঁকেছে কে?'

'আমি এঁকেছি', আরক্ত হয়ে তার হাতুড়িটা নামিয়ে রেখে খানিক ইতঃস্তত করে ছেলেদের মধ্যে একজন বল্‌লো।

'ছবিটির শিরোনামা কে লিখেছে?'

'ও লিখেছে, ও লিখেছে', মেয়ের দল একটি শান্ত লাজুক চশমা-পরা ছোট্ট ছেলেকে দেখালো।

'আশা করি তোমার শিক্ষক তোমায় এটা লিখতে বলেছিলেন।'

'না', প্রথম ছেলেটি কৌতুক ভরা চোখ নিয়ে বল্‌লো, 'এটা আমরা নিজেরাই বার করেছি।'

উইলিয়াম স্মিথের ছোট্ট বন্ধুটির ছোট করে ছাঁটা চুলে ভরা গোল মাথাটিকে অন্যমনস্কভাবে আমি স্পর্শ করলাম। আমার মনে পড়লো ১৯৪১'এর সেই ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মকালের কথা, ভেলিকিয়ে লুকি, আর সেই হেলমেট-পরা অফিসারটির কথা। তার সেই সান্ত্বনা বাণী কী আশ্চর্য ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে ছোট্ট এই লিথুয়ানিয়ান গ্রামে। ছোট্ট একটি ছেলে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করেছে এক টুকরো কাগজের ওপর আর পিন দিয়ে এঁটে দিয়েছে স্লেজের উপর দ্রুত ধাবমান এক ইয়াকুতের পাশে, তার পাশেই ক্রেমলিনের মিনারের ছবি।

আর আমার হৃদয় এক অবর্ণনীয় আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো সেই অজানা সোভিয়েত সৈনিকটির প্রতি। তার পরিশ্রম এবং কীর্তির অন্তরাত্মা লিথুয়ানিয়া'র ছেলেমেয়েদের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে। কিছুই এসে যায় না সে আজ কোথায় আছে এই খবরে—সে নিরাপদে লড়াই থেকে ফিরেছে কিম্বা ওডার'এ মারা গেছে—সে খবরে কিছুই এসে যায় না। যে বীজ সে এনেছিল আর পুঁতেছিল, আমার মাতৃভূমি লিথুয়ানিয়া'র মাটিতেও তা অঙ্কুরিত হয়েছে।

মিকুটিসের বিপদ

১

জমে যাওয়া জানালার পাশে গুটি-সুটি হয়ে বসে ছেলেরা অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলো — তুষার-ঢাকা মাঠের মধ্যে কালো এক বিন্দুকে ঘুরে বেড়াতে দেখবার আশায়। আর প্রতিবার বাতাস যখন দরজাটাকে ধাক্কা দিয়ে সশব্দে বন্ধ করছিল সবাই তারা ছোট একটি দল করে

বারান্দায় যাচ্ছিল দৌড়ে। তাদের বাবা কিন্তু কোনো দিনই ফিরলেন না।

পরের দিন গ্রামে তারা শুনলো ফ্যাসিস্টরা বাজারটা ঘিরে ফেলেছে—বুড়োদের তারা বাড়ী ফিরতে দিচ্ছে আর যোয়ানদের যাচ্ছে বন্দী করে নিয়ে।

সংসারের কর্তা হোলো মিকুটিস। খড় দিয়ে তার বাবার বিরাট কাঠের জুতো-জোড়া ভরে, যাতে সেগুলো পা থেকে খুলে না যায়—মিকুটিস শীঘ্রই কাজে আকণ্ঠ ডুবে গেল। শস্যের মরাই থেকে গোয়াল পর্যন্ত সে দৌড়োদৌড়ি করতে লাগলো—আর ছাউনি থেকে পুকুর পর্যন্ত। জন্তুগুলোকে যত পারে খাওয়ানোয় প্রথমে মজা ছিল। মজা ছিল পুকুরে তাদের নিয়ে যেতে এবং তারপর গোয়ালে ফিরিয়ে আনতে, আর চেঁচাতে আর ঘুষি নাড়াতে—যদিও তার চেঁচানোর কিম্বা ঘুষি পাকিয়ে ভয় দেখানোর প্রয়োজন ছিল না। গোয়ালের কাছেই ছিল পুকুরটা। কিন্তু ঘোটকীকে মিকুটিস বেড়াটা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে সর্বদাই তার পিঠে চেপে যেতো পুকুর পর্যন্ত। ঘোটকীটা ছিল বুড়ি আর অন্ধ। তার গায়ের লোমগুলো উঠে গিয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে সাজ পরে। সেটা এসেছিল পরিবারের যোয়ান টগবগে ‘গ্নেদক’এর পরিবর্তে—ফ্যাসিস্টরা যেটাকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিল।

'হেই, কোথায় চলেছিস বলে ভাবছিস?' ঘোটকীকে উদ্দেশ্য করে মিকুটিস চেঁচিয়ে ওঠে।

সেটা তার কানটাকে চ্যাপ্টা করে মাথা নাড়ায়, মনে হয় যেন কথাগুলো বুঝে সে সম্মতি জানাচ্ছে।

জন্তু-জানোয়ারদের পাট চুকিয়ে গোয়ালের দরজাটাকে কাঠের বোঝা দিয়ে বন্ধ করে, মরাইটায় তালা লাগিয়ে সে এমন কিছু ভাবতে চেষ্টা করতো যাতে রাত পর্যন্ত খামার সম্বন্ধে ব্যস্ত থাকতে পারে।

সে জান্‌তো পশুদের জন্যে গোয়ালে যথেষ্ট বিছানা নেই। সে জান্‌তো গোলা-ঘরের মধ্যে আঁটি বাঁধা শস্য আছে—যেগুলোকে তার বাবা শত্রুদের কাছ থেকে লুকোবার জন্যেই ইচ্ছে করে না ঝেড়ে রেখেছেন।

ছেলেটি গোলা-ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

কয়েক বোঝা খড় ছুঁড়ে ফেলে, সে টেনে বার করলো লুকোনো আঁটি বাঁধা গম, তারপর সেগুলোকে আছড়াবার মেঝেয় দু'সারি করে রাখলো আর বড়দের মতো নিজের হাতের তালুতে থুতু লাগিয়ে সে ক্রমাগত সেগুলো চল্‌লো আছড়িয়ে। সে কাজ করে চললো এক কিম্বা দু'ঘণ্টা ধরে, তারপর শস্য দানাগুলোকে এক কোণে ঝেঁটিয়ে জড় করে একটা থলে দিয়ে ঢেকে খড়গুলোকে গোয়ালে নিয়ে চললো।

এতো বেশী পরিমাণ খড় সে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল তার মধ্যেই সে বুঝি ডুবে যাবে। সেগুলোকে সে ছড়িয়ে দিতে লাগলো গরু, ঘোড়া আর ভেড়াদের বিছানার জন্যে। সমস্ত গোয়ালটা এতো পরিচ্ছন্ন এবং এতো প্রফুল্ল হয়ে উঠলো যে সেটার দিকে চেয়ে মিকুটিসের মনে হলো যে সেখানে থাকতে বললে সে আপত্তি করবে না।

কিশোর কৃষকটির অনেক কাজ। প্রতিদিনই নতুন নতুন সমস্যা এসে হাজির হয়। ঝাড়াই করা শস্যের খোসা ছাড়াতে হবে, পথ থেকে সরাতে হবে তুষার, নতুন ডিমগুলোকে হবে সংগ্রহ করতে।

সর্বপ্রথম ঘুম থেকে উঠতো বলে মিকুটিসকে উনুনে আগুন জ্বালাতে হতো। ভিজে আর জমে যাওয়া অলডার গাছের ডাল-পালাগুলো অতি বাজে জ্বালানি কাঠ হতো। আর তাকে ফুঁ দিয়ে চলতে হতো যতক্ষণ না তার মাথা ঘুরে ওঠে। ধোঁয়ায় তার চোখ আর গলা জ্বলে যেতো আর কাশ্‌তে কাশ্‌তে চোখ দিয়ে আর গাল বেয়ে জল ঝরতো।

বড়দিনের ঠিক পরেই মিকুটিসের মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর পায়ের কি যেন একটা গণ্ডগোল হলো। বিছানা থেকে দরজা পর্যন্ত বহুকষ্টে তিনি আসতে পারতেন। মিকুটিসের দুই ভাই খুব ছোট ছিল বলে সাহায্য করতে

পারতো না। গোলাবাড়ীর সমস্ত দায়িত্বই ছেলেটার ঘাড়ে পড়লো।

তার মা একটু সুস্থ বোধ করার পর ঠিক করলেন গোলাবাড়ীটা মিকুটিস কি ভাবে চালাচ্ছে দেখবেন। লাঠিতে ভর দিয়ে মরাইটা দেখবার জন্যে তিনি চললেন তারপর গোলা-ঘরে পোঁছে দরজার ফাটলের ভেতর দিয়ে চেয়ে দেখলেন। কিছু কিছু কারণে করলেন তাকে প্রশংসা আর কিছু কিছু কাজে তাকে করলেন ভর্ৎসনা। দরজা থেকে ফিরে মুরজা'র পিঠ চাপড়াবার জন্যে তিনি দাঁড়ালেন তারপর গেলেন গোয়াল-ঘরে, তাঁর পিছন পিছন চললো এক পাল মুরগি। গোয়াল-ঘরটা পরিষ্কার ছিল, মেঝেয় ছিল তাজা খড়। জন্তগুলো হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে সেগুলোর ওপর ছিল দাঁড়িয়ে। তারা খাদ্যগুলো স্পর্শ করছিল না কিন্তু পায়ের কাছেকার খড়গুলো মুখ দিয়ে জড়ো করে তাদের বিছানাটাকে টেনে আগ্রহ সহকারে খাচ্ছিল। তাদের ব্যবহারে প্রথমে মিকুটিসের মা বিস্মিত হলেন, কিন্তু তাঁর অভ্যস্ত চোখ শীঘ্রই জানালো ব্যাপারটা কী। এক মুঠো খড় তুলে সেগুলোকে আঙুল দিয়ে অনুভব করে তিনি চিৎকার করে উঠলেন:

'হায় কপাল। আমার ছেলেটার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বিছানার জন্যে দিয়েছে সে আঝাড়া খড়। এই দেখো, শস্যেতে ভারি এগুলো…'

'আমি··· আমি এগুলোকে ঝেড়েছিলাম মা', মিকুটিস তার দোষ স্খলন করতে চেষ্টা করলো, গরুটার পিছন থেকে তার মা'য়ের ঘুষি পাকানো হাতের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে সে বললো।

'তোর মাথায় গোবর ভরা। আমাদের আর শস্য থাকবে না। ক্ষুধায় সবাই আমরা মরবো।'

'কিন্তু সত্যি বলছি মা—এগুলোকে আমি ঝেড়েছিলাম। কিন্তু ঢেঁকিটা খুব ভারি ছিল', ছেলেটা অনুনয় করে বল্লো।

গোয়াল-ঘরটা এলোমেলো দেখে মিকুটিসের মা সব দোষ তার ঘাড়ে চাপালেন। বাইরের ঘরগুলো আবার তিনি খুঁটিয়ে দেখলেন, ভুল কোণ থেকে খড় নেবার জন্যে বকলেন মিকুটিসকে—বকলেন ঠিক জায়গায় জিনিষগুলো না রাখার জন্যে। সেই দিন থেকে যখনই সে খামারে যেতো তার মা সর্বদাই তাকে অনুসরণ করতেন। সবে অসুখ থেকে ওঠায় দুর্বল বলে তাঁকে প্রায়ই থামতে হতো নিশ্বেস নেবার জন্যে। ছেলেকে সাহায্য করতে তিনি পারতেন না কিন্তু প্রতিপদে খিটখিট করতেন।

মিকুটিসের দুর্দিন সুরু হলো। কুঁড়ে ঘরের মধ্যে প্রতিদিন অনেকবার জল নিয়ে আসতে হতো তাকে,-

প্রতিবারই জল উপচে পড়তো তার গায়ে। তার ওপর ছিল ভারি ভারি জালগুলো, যেগুলোকে টেনে আনতে হতো তাকে।

প্রথম দিকে উৎসাহের সঙ্গে মিকুটিস তার কাজ করতো — কাজ করতে করতে শিশ দিতো আর গান গাইতো। অধৈর্য্য হয়ে সে অপেক্ষা করতো প্রত্যূষের যখন সে আবার গোয়াল-ঘরে যেতে পারে। শীঘ্রই কিন্তু তার ক্লান্তি এসে গেলো। তার উৎসাহ এলো ঠাণ্ডা হয়ে। যাই হোক, কাজে ফাঁকি দেবার ছেলে সে নয়। নিঃশব্দে সে করে যেতে লাগলো তার কাজ, কোনো রকম তাড়াহুড়ো না দেখিয়ে। যখনই বুদ্ধির দরকার হতো এমন ভাবে মাথার পেছন দিকটা সে চুলকোতো যে মনে হতো কৃষি-বিদ্যার সব কিছুই সেখানটায় ভিড় করে রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই সে বুঝতে পারতো তাকে কী করতে হবে।

প্রথম শীতে ছেলেটা অনেক কিছু শিখলো। শস্য এবং ঘি-মাখনের ভার তার ওপর ছিল। তার ওপর ভার ছিল বাড়ীর সমস্ত গুপ্ত সঞ্চিত সম্পত্তির—এমন কি তার বাবার রূপোর ঘড়িটার ওপরেও।

জন্তু-জানোয়ারগুলো তাকে চিনে ফেললো। গোয়ালে যখন সে যেতো গরুটা ডেকে উঠে চাট্‌তো তার হাত

আর যেন অভ্যর্থনা করার ভঙ্গীতে ঘোটকীটা তার অন্ধ চোখগুলো ঘোরাতো।

প্রতি সকালে গভীর ঘুমন্ত এই কিশোর কৃষককে ডেকে তুলতেন তার মা।

'ওঠ রে ওঠ। জন্তুগুলো ইতিমধ্যেই তোকে ডাকতে সুরু করেছে।'

ঘুমের মধ্যে তার মনে হতো যে ভেড়াগুলো, গরু আর বাছুর যেন তার নাম ধরে ডাকছে:

'মি-কু-উ-টিস।'

পুকুরটার ওপর স্কেট করার কিম্বা স্লেজে চড়ে পাহাড় থেকে নাবার মতো কোনো অবসর ছেলেটির ছিল না। ফাঁদ পাতার তখন সময় হয়ে গেছে, কারণ খামারের চারদিকে খ্যাঁকশেয়াল আর খরগোসগুলো ক্ষুধার তাড়নায় হাজির হয়েছে। প্রত্যূষে কুটীরের চারিদিকে তাদের পায়ের ছাপ দেখা যায়—দেখা যায় গাছ্‌গুলোর ওধারে আর খড়ের গাদার পাশে। ঝোড়ো ছিল সে বছরের শীতকাল—প্রায় সর্বদাই বাতাস বইতো জোরে আর তুষারের পুরু চাদর বিছিয়ে থাকতো মাটি আর ঝোপঝাড়ের ওপর। প্রতিদিন সকালেই বায়ু তাড়িত তুষার রাশির ভেতর দিয়ে বরফের গহ্বর পর্যন্ত খুঁড়তে হতো পথ। ফাঁদ পাতার সময় তার কোথায়?

তার জমে-যাওয়া পাগুলো গরম করার জন্যে টলতে-টলতে কুটিরে ফেরার পরেই মা তাকে বলতেন:

'মিকুটিস, প্রাতরাশের জন্যে কিছু জই কি গুঁড়িয়ে রাখতে পারবি? বাড়ীতে আর একটা দানাও নেই।'

'খোকা, চেয়ে দেখ আকাশটা কি রকম লাল। আজ রাত্রে ঝড় উঠবে। ছাত থেকে যাতে খড়গুলো উড়ে না যায় তার জন্যে তুই কি কয়েকটা বাঁশ লাগাতে পারিস?'

'জমিদারের কাছে মাখনটা নিয়ে যেতে ভুলিস না কিন্তু, লক্ষ্মীটি।'

মিকুটিসকে সর্বদাই ব্যস্ত থাকতে হতো, সর্বদাই দৌড়োচ্ছে এদিক ওদিক, কাজে কখনোই ফাঁকি দেয় না। কান্না যে কি জিনিস সে ভুলেই গেল। বাতাসে তার সব চোখের জল শুকিয়ে গেছে, কিম্বা কুঁড়ে ঘরের তিক্ত ধোঁয়ায় গেছে ঝরে।

এমন এক সময় ছিল যখন সে দূরে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত হয়ে জমিদারের কুঠি দেখতো। শত্রুরা এখন সেখানে থাকে আর ছেলেটাকে নিয়ে যেতে হয় তাদের জন্যে খাবার যেটা তারা প্রত্যাশা করে তাদের খামার থেকে। একটা মাত্র গরু তাদের ছিল, আর তার মাকে, তিনি যতটুকু পারতেন ততটুকু ননী সংগ্রহ করে, মাখন বানিয়ে ফ্যাসিস্টদের

পাঠাতে হতো। আর মাখনই শুধু নয়। প্রায়ই তাঁকে রুমালে বেঁধে দিতে হতো ডিম, পশম, কখনো বা শুয়োরের লোম কিম্বা ছেঁড়া কাপড়। সব কিছুই শত্রুদের কাজে লাগে। কৃষকরা যে সব ডিম আর চর্বি নিয়ে আসতো সেগুলো খেতো তারা। এ পর্যন্ত পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু শুয়োরের লোম আর ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলোয় তাদের কী দরকার? গ্রামের মধ্যে কৃষকরা বলতো যে তারা ছেঁড়া নেকড়ার মধ্যে উকুন পুষে সেগুলোকে টিপে চর্বি বার করে।

প্রথম যেদিন মিকুটিসকে জমিদার বাড়ী যেতে হয়েছিল খুড়ো য়ুয়োজাস তাকে বলে দিয়েছিল পথ। ফল বাগানের মধ্যে দিয়ে যতক্ষণ না পাথরের ফটকে পৌঁছয় ততক্ষণ তাকে হাঁটতে হবে। সেখান থেকে তাকে মোড় ঘুরতে হবে বিরাট বাড়ীটার দিকে। সেইখানেই কৃষকদের কাছ থেকে জার্মানরা মাখন গ্রহণ করতো।

প্রত্যেক জার্মানকে দেখবার পর যাতে সে টুপি খুলে 'মোএন' * বল্‌তে ভুলে না যায় সে সম্বন্ধে য়ুয়োজাস খুড়ো ছেলেটাকে সাবধান করে দিয়েছিল। পাছে সে ভুলে যায় এই ভয়ে মিকুটিস সমস্ত পথ কথাটা আওড়ে চললো।

---

* 'গুটেন মর্গেন'এর অপভ্রংশ।

প্রত্যেকটা খানা টপকে যাবার পর সে বললো 'মোএন', পথের প্রত্যেকটা পাথরকে সে বললো 'মোএন'।

ফলের বাগানের মধ্যে ছেলেটা তার কোটটাকে এঁটে পরলো, ভালো করে বাঁধলো তার পুঁটলিটাকে, আর ঘাসের মধ্যে নেবে দুটো অপরিষ্কার পাকে শিশিরে মুছে বার দুই বল্‌লো 'মোএন'। ফটকের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় এমন একটা ঘটনা সে দেখল যাতে তার রক্ত গেল জল হয়ে। দুটো ওক গাছের চারার মধ্যে দড়ি দিয়ে টেনে বাঁধা ছিল একটা বাছুর। বাছুরটার নীচে মাটির ওপর উবু হয়ে বসেছিল একটা লোক। তাকে দেখতে বিরাট একটা বেড়ালের মতো। বাতাসে উড়ছিল ধোঁয়ার কুণ্ডলী। মানুষটা কি বাছুরটাকে পোড়াচ্ছিল? না, সে কেবল একটা পাইপ টানছিল আর লম্বা একটা ছুরি দিয়ে ছাল ছাড়াচ্ছিল বাছুরটার। সে জার্মান। য়ুয়োজাস খুড়োর আদেশ স্মরণ করে ততক্ষণাৎ মিকুটিস তার টুপিটা খুলে ফেললো। কিন্তু য়ুয়োজাস খুড়ো যে কথাটা তাকে মনে রাখতে বলেছিল সেটা যে গেল ভুলে। পাথরের মতো এক মুহূর্তের জন্যে জমে গিয়ে সে টের পেলো মরা বাছুরটার ছাল ছাড়াতে ব্যস্ত জার্মানটা তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। একটা র‍্যাসপ্‌বেরি ঝাড়ের ভেতরে পা টিপে টিপে সে পিছিয়ে

গেল। যতই কেন না সে কঠিন ভাবে ভাবুক, যতই কেন না নাড়াক তার জিভ—কিছুতেই কথাটা সে মনে করতে পারলো না। সে শুনেছিল অভিবাদন না করলে জার্মানরা রেগে ওঠে। রুমালটা খুলে পথের ওপর মাখন-ভরা পাত্রটা রেখে একটা খাদের মধ্যে চুপি-চুপি পালালো। সেখান থেকে খাদের মধ্যে দিয়ে মাথা নিচু করে দৌড়ে সে বাড়ী ফিরলো—যাতে কেউ না তাকে দেখতে পায়।

মিকুটিস তার মাকে সব কথাই বললো—জমিদার বাড়ীতে যা সব সে দেখেছিল আর কেমন করে ভুলে গিয়েছিল 'মোএন' কথাটা। অবশ্যই তিনি তাকে বকলেন, বললেন নিরেট বোকা, আর কখনোই একলা তাকে পাঠালেন না। কিন্তু সে সব ঘটনা ঘটেছিল শীত যখন স্বুরু হয়েছে তখন—যখন মিকুটিস ভালো করে জানতো না কি করে জানোয়ারদের খাওয়াতে হয়, লাঙল দিতেও যখন সে আনাড়ি ছিল। পরে জমিদার বাড়ীতে শস্য আর পাট একলাই সে পৌঁছে দিতে যেতো—এমন কি একবার সে কূয়োটার মধ্যে থুথুও ফেলেছিল।

বসন্ত যখন এলো ছেলেটা অন্ধ ঘোটকীটাকে লাঙলে যুতে মাঠে চললো। সংসারের সবাই তাকে দেখবার জন্যে বেরিয়ে এলো। অন্ধ ঘোটকীটাকে নিয়ে কাজ করা সহজ

নয়। মিকুটিসের এক ভাই লাগাম ধরে সেটাকে পথ দেখিয়ে চলছিল, যাতে লাঙলটা সোজা থাকে। লাঙলটা কিন্তু চালকের বাগ মানছিল না। হয় সেটা গভীর ভাবে খুঁড়ছিল নয় আঁচড়ে চলছিল জমিটাকে। চোখের মধ্যে ঝরে পড়া ঘামকে মোছবার সময় মিকুটিস পাচ্ছিল না—কারণ যে মুহূর্তে সে হাত আলগা করছিল সেই মুহূর্তেই জমি থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছিল লাঙলটা। ঢিবিতে ধাক্কা খেয়ে, পাথরে পা ছেঁচড়ে, চোখের জলের জন্যে প্রায়ই লাঙলটাকে দেখতে না পেয়ে, কান্না চাপবার জন্যে ছেলেটা এমন ভাবে ঠোঁট কামড়াতে লাগলো যাতে বেরিয়ে এলো রক্ত। লাঙলটা নির্মম ভাবে কালো, অসমান মাটি কেটে চললো। মিকুটিসের পেণ্টুলুনটা ক্রমাগত পিছলে নেবে আসতে লাগলো। লাগামটা ক্রমাগতই ঢিলে হয়ে আসতে লাগলো। বারবার দরকার হচ্ছিল লাগাম আর পেণ্টুলুনটাকে কষে বাঁধবার। মাছিগুলো তাড়াবার জন্যে অন্ধ ঘোটকীটা ক্রমাগতই মিকুটিসের মুখে নাড়াচ্ছিল তার ল্যাজ। তাতে চটে উঠে সে সেটাকে লাথি মেরে গালাগালি দিল ফ্যাসিস্ট বলে। ঘোটকীটার লাগাম ধরে টেনে মিকুটিসের ছোট যে ভাই যাচ্ছিল ঘ্যানঘ্যান করে সে বলে উঠলো যে সেটা তার পা মাড়িয়ে দিচ্ছে আর মাথায় লালা ফেলছে।

অসুখ থেকে ওঠার পর তখনো দুর্বল তার মা ঝোপের পাশে বসে বিলাপ করতে করতে মিকুটিসের কষ্ট আরো বাড়িয়ে দিলেন:

'ওরে আমার ছোট চাষী, ওরে আমার অনাথ ছেলে! তোর চষা জমি থেকে আমরা কোনো রুটি পাবো না। গ্রামে আমরা খবর নেবো, আর কাউকে হয়তো পাবো অন্তত অর্ধেক শস্যের জন্যে জমিটা চষে দিতে…'

দুপুর নাগাদ ছেলেটা একেবারে থকে গেল। তার পা আর চলে না। আঁকড়ে লাঙলটা ধরে নিজেকে সে টেনে নিয়ে যেতে দিল। তার মোটা সার্ট ঘামে ভিজে পিঠের ওপর আট্‌কে গেল আর কাদার চাঙড় ভারি হয়ে আট্‌কে রইলো পায়ের ওপর। সূর্য উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হলো। জ্বলে উঠলো সমস্ত মাঠ আর একটি হ্রদের মত সেটা তার চোখের সামনে ঝিক্‌মিক করে উঠলো। উত্তাপে হতবুদ্ধি হয়ে ঘোটকীটা ঝোলালো তার মাথা, ডিমের মতো সাদা তার চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে এলো।

সন্ধ্যে পর্যন্ত মিকুটিস কাজ করে চললো। ঘোড়াটার জোয়াল খুলে, নদীতে পা ধুয়ে, নদীর তীরেই সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলো। স্বপ্নে সে দেখলো তার চষা জমিতে কাকগুলো লাফিয়ে বেড়াচ্ছে আর তার

মাথার ওপরে ডাকছে। সব জায়গাতেই তারা: মাঠের ওপর আর আকাশে, অন্ধ ঘোটকীটার পিঠে আর লাঙলটার উপর। মিকুটিস তাদের দিকে চাবুক হাঁকালো আর লাথি মারতে লাগলো। ঝোপের কাছে বসে তার মা বিলাপ করতে লাগলেন:

'ওরে আমার মানিক, তোর চষা-জমি থেকে আমরা কোনো রুটি পাবো না, আমরা পাবো না…'

যতক্ষণ না মাঠের বড় একটা চাক্‌লাকে সে চষে ফেলতে পারলো মিকুটিস নাছোড়-বান্দার মত তার পিছনে লেগে রইলো। এক দৃষ্টিতেই সহজে বোঝা যায় প্রথমদিন ছেলেটা কোথায় চাষ করেছে, কোথায়ই বা দ্বিতীয় দিন। প্রথম দিনের লাঙলের দাগ গেছে পাগলের মতো এঁকেবেঁকে; পরের দিন সেগুলো হয়েছে কিছু সোজা। আর তৃতীয় দিনে সেগুলোকে দেখাচ্ছিল যেন এক পাকা চাষীর কাজ। প্রথম দিকে অন্ধ ঘোড়াটা লাগাম ধরে নিয়ে গেলেই যেতো, কিন্তু তারপর মিকুটিস যখন শিখলো লাগামগুলো কি করে ব্যবহার করতে হয় সেটা তখন এমন ভাবে লাঙল টানতে লাগলো যেন সে তার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে।

চষবার পর মাঠে মই দেওয়া দরকার। মিকুটিস প্রায়ই বুঝতে পারতো না সে মাঠে কাজ করছে না ঘরে ঘুমচ্ছে।

দিবা-রাত্র রৌদ্রে উজ্জ্বল মাঠের স্বপ্ন সে দেখতো, মই-এর তলা থেকে ধূলো উড়ছে, জ্বলন্ত ফুলকির মত মাছিগুলো ঘোড়াটার ওপর নাচছে। কেবল কাকের ডাক আর মাঝে মাঝে টিট্টিভের বিলাপ শোনা যায়। সর্বদাই শিশিরে ভেজা এবং রোদে-শুক্নো কাদায় ছেলেটার পা রক্তাক্ত ফোস্কায় ভরে ওঠে; তার পায়ের ফোস্কাগুলোকে দেখে মনে হতো যেন অল্ডার গাছের ছাতা। ছাল উঠতে লাগলো তার গোড়ালি আর কাজে ক্ষয়-ধরা আঙুল থেকে। সেগুলো ফাট্তে লাগলো, টন্টন্ করতে লাগলো, আর আবার নতুন করে গজাতে লাগলো। ঘুমতে সে পারতো না। হয় সে ছট্ফট্ করতো কিম্বা বলের মত পাকিয়ে যেতো কিম্বা মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকতো। ছেঁড়া ন্যাকড়ায় পুঁটলি করা পুরু 'ক্বাস' সেঁক দেবার জন্যে তার পায়ে থাকতো বাঁধা। দপ্দপ্ করা মাথা নিয়ে সে জেগে থাকতো। ছাতের ফুটো দিয়ে তারাগুলোকে দেখা যায়। প্যাঁচার ডাক শুনতে পায় সে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমকে খামারটা এত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে সে মেঝের ওপর ইঁদুরের ছুটোছুটি দেখতে পায়। প্রত্যূষে, তারাগুলো যখন মিলিয়ে আসে, তখন এতো বিশ্রী লাগে মিকুটিসের, যে ইচ্ছে হয় সে যেন মরে যায়।

মরে যেতে, চিরকালের জন্যে ঘুমিয়ে পড়তে, এই যন্ত্রণা আর অনুভব না করতে!

সূর্যোদয়'এর ঠিক আগেই ছেলেটার চোখ দুটো ভারি হয়ে আসে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই তার মা খামারের দরজায় ধাক্কা দেন।

'মিকুটিস! সূর্য অনেক ওপরে উঠেছে। জেগে ওঠ মানিক, তোর প্রাতরাশ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!'

ছেলেটা জেগে উঠতো, কোন রকমে নাড়াতে পারতো তার পা। এক পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে মাঠ থেকে তাড়াতো কাক আর মুরগিগুলোকে; কুকুরটাকে লেলিয়ে দিতো তাদের দিকে আর তার মাকে সাহায্য করতো রান্নাঘরের পিছনের সব্জি-বাগান থেকে আগাছা তুলতে।

মিকুটিসের সোনালি চুলগুলো রোদে আর জলে সাদা হয়ে গেল, তার কাণ আর মুখ মেছেতায় ভরে উঠলো আর নাকের চামড়া পড়তে লাগলো খসে খসে। হাতগুলো তার কর্কশ হয়ে উঠলো। এক বছরের মধ্যেই মিকুটিস তার সার্ট আর প্যাণ্টের চেয়ে বড় হয়ে উঠলো, সাপের মত খোলস ছাড়লো সে। প্রমাণ লোকরা যে-ভাবে কাজ করে সে-ভাবে তাদের সে অনুকরণ করে চললো। যে নিপুনভাবে ঘোড়াটিকে সে লাঙলে জোতে আর কাস্তেয় শান দেয় তাই

দেখে তার ভাইরা তাকে হিংসে করতে লাগলো। কিন্তু তারা তাকে বেশী হিংসে করতো তার শিশ দেওয়া আর দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুথু ফেলা দেখে। দাঁতের এক আশ্চর্য্য ফাঁক দিয়ে তার পছন্দ মতো যে কোনো সুর সে বাজাতে পারতো আর মাঝে মাঝে সেই ফাঁক দিয়ে এমন দক্ষতার সঙ্গে থুথু ছিটোতে পারতো যে মনে হতো সেটা বুঝি কোনো এক গুল্‌তির ভেতর থেকে ছিটকে পড়ছে। মিক্‌টিসের মত একটা দাঁতের ফাঁকের জন্যে তার ভাইরা একটা করে দাঁত বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিল। . .

ছুটীর দিনে মিকুটিস যখন তার বাবার কালো ওয়েস্টকোটটা পরতো, তার ভাইরা জানতো তাদের বাবার ঘড়িটাও সে পরবে। বাড়ীর সেই তরুণ কর্তা ওয়েস্টকোটটা পরতো কেবল পকেটের মধ্যে রূপোর ঘড়িটা পোরার জন্যে। আর কড়িকাঠের ভেতরকার লুকনো জায়গা থেকে সিল্কের রুমালটা নিয়ে তার ভেতর থেকে বার করতো ঘড়িটাকে। বড় একটা পেঁয়াজের মাপের সেটা, তাতে দুটো চাবি। সেটায় দম দিয়ে, ওয়েস্টকোটের বোতামের ঘরে তার চেনটাকে আট্‌কে ঘড়িটা পকেটে নিয়ে মাটিতে ডোবা পুরোণো একটা পেষাই-জাঁতার পাথরে বসার জন্যে পেষাই-কলের দিকে সে যেতো। এইখানে গির্জে থেকে ফেরার পথে

বুড়ো লোকরা ধূমপানের জন্যে থামতো। প্রতিবেশীরা জড়ো হতো তাদের সব খবর আদান-প্রদানের এবং তাদের দুঃখ জানাবার জন্যে। কথাবার্তার বিষয়বস্তু প্রধানতই ছিল লড়াই, জার্মান, মাথা গুণতি ট্যাক্স, অসুখ-বিসুখ, খাদ্য এবং শস্য সম্পর্কে। হয়তো তার ঘড়ি, কিম্বা তার বিলুপ্ত পিতার স্মৃতি, কিম্বা তার সংসারে কর্তা হওয়া এবং তাদেরই মত তার হাতগুলোয় কড়া পড়ায় কৃষকরা তাদের সমস্যা নিয়ে মিকুটিসের সঙ্গে আলোচনা করতো—যেন সে তাদের সমানে সমান। তার পরামর্শ তারা চাইতো।

'ভগবানই জানেন এ বছর গম কি রকম হবে। যে-দিকেই তাকাও সে-দিকেই চিপ্‌সনো গমের দানা দেখা যায়।' তার ঘড়ির চেনটাকে আঙুলে নাড়াতে নাড়াতে মিকুটিস বলে। পাহাড়টায় যেখানে পেষাই-কল আছে সেখান থেকে মাঠের দিকে তাকায় সে, যেখান থেকে প্রত্যেকটি সীমানা রেখা এবং প্রত্যেকটি ফালিকে স্পষ্ট দেখা যায়।

কথাগুলো যদিও একটি ছেলের বলা কেউই তবুও সেটা শুনে ভ্রূ কোঁচকালো না। প্রায় প্রত্যেক খামার থেকেই হয় কোনো পিতা না হয় কোনো ভাই হারিয়ে গেছে। জার্মান সৈন্যে যোগ দেবার ভয়ে কেউ পালিয়েছে, অন্যদের সৈনিকরা ধরে নিয়ে গেছে বিদেশে। সব খামারের তত্ত্বাবধানে

রয়েছে বুড়ো, বুড়ি আর ছেলেরা। পেষাই-কলের বারান্দায় রবিবার কেবল বসে থাকতে মিকুটিস দারুণ তৃপ্তি পায়। এখানেও কিন্তু, ছুটীর দিনে সবাই যখন কুঁড়েমি করে, মিকুটিসের তখন কাজ থাকে। একদিন তার ছোট ভাই'এর চুল কাটতে দেখে য়ুয়োজাস্ কাকা তার মাথার পিছনের চুলটি তাকে কেটে দিতে বললো।

তারপর চুল ছাঁটা আয়নায় খুঁটিয়ে দেখে অনুমদোন করে বললো, 'একেবারেই খারাপ নয়। ছেলেটা বাস্তবিকই তুখোড়।'

তখন থেকেই মিকুটিস তার প্রথম স্থায়ী মক্কেল পেলো। প্রতিবেশীদের মধ্যে এই নতুন নাপিতের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো, আর ছুটীর দিনের আগে ছেলেটাকে খামারে কাজ করতে দেখলে তারা কাছে এসে চিৎকার করতো:

'মিকু-উট! কাল তোমার কাঁচিটা এনো।'

মিকুটিস যেতো পেষাই-কলে তার কাঁচি আর চিরুণী নিয়ে। যে প্রতিবেশীর পালা তাকে পেষাই-জাঁতার পাথরে বসিয়ে ছেলেটা দ্রুত কাঁচি চালাতো, পিছিয়ে আসতো দু'এক পা, আবার যেতো কাছে, তারপর তার মক্কেলের কাণে বেড়ালের মতো তৃপ্তির শব্দ করতো।

'ঠিক তার বাপের মতোই! আমাদের নাপিতের জায়গা তার বাবার মতই সে নিয়েছে। মড়ার মাথার চুল সেই কাটতো সব সময়। চুল কাটতে কখনোই সে না বল্‌তো না,' বুড়োরা বললো।

তার বাবার মতোই মিকুটিস জানতো প্রত্যেককে কি করে খুসি রাখতে হয়। দর্জি আদোমাস'এর চুল কাটার সময় সে জান্‌তো যাতে তার মাথার আবটায় খোঁচা না লাগে সে বিষয়ে তাকে সাবধান হতে হবে। তার আবটা নবাঙ্কুরিত গরুর শিং'এর মতো মাথার মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে। পেত্রাস ভিঙ্ক্‌স্‌না'র বেলায় সে জানতো লোকটার ক্ষত-চিহ্ন ঢাকবার জন্যে খানিকটা চুল রাখা দরকার।

ক্রমশ তার সমস্ত প্রতিবেশীর মাথা সে চিনে ফেললো। প্রত্যেকটি ক্ষত-চিহ্ন এবং প্রত্যেকটি ঢিবির পিছনে একটি করে নিজস্ব গল্প আছে। আদোমাস'এর ঢিবিটা গজিয়েছিল সেণ্ট মাতাউশাস'এর দিনে। তার এক শালার সঙ্গে বিয়ার পান করার সময় আচমকা তার মাথার ওপরে হাত দিয়ে একটা নরম ফোলা জায়গা সে আবিষ্কার করলো। আর তারপর দিন সে দেখলো ইতিমধ্যেই একটা আব গজিয়েছে সেখানে। তারপর থেকে যখনই সে সামান্য মাতাল হতো তার স্ত্রী তাকে ডাকতো শিংওলা শয়তান

বলে। জমিদার জেবেস্কা'র কাছে কাজ করার সময় পেত্রাস ভিঙ্ক্‌স্‌না পেয়েছিল সেই ক্ষত-চিহ্নটা। একদা এক শরৎকালে জমিদারের বাগানে ফল পাড়বার সময় একটা প্লামের গায়ে আস্বাভাবিক রকম নানা ফুস্‌কুড়ি দেখে গাছটার উপর থেকে হেঁকে বললো: 'মেয়ের দল চেয়ে দেখ্‌, ঠিক যেন এটা জেবেস্কার নাক।' আর তারপর প্লামটাকে মেয়েদের দিকে সে ছুঁড়লো। কিন্তু তারা হাসতে সুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেল্‌লো। মেয়েদের মধ্যে একজন জোরে কাশতে লাগলো। ভিঙ্ক্‌স্‌না ঠিক তখনই জেবেস্কাকে গাছের তলায় দেখতে পেলো। স্পষ্টতই তখনি সে বাগানে পেঁাচেছে। তৎক্ষণাৎ গাছ থেকে চাষীকে নামতে জমিদার হুকুম করলেন এবং ভিঙ্ক্‌স্‌না মাটিতে নাবার সঙ্গে সঙ্গেই ছড়ি দিয়ে দারুণ জোরে তার মাথায় তিনি আঘাত করলেন।

চিৎকার করে তিনি বললেন, 'এই নে—এটা তোর প্লামের পাওনা।'

ঠিক তখনই হাত দিয়ে মাথা ঢাকার ফলে জমিদারের দ্বিতীয় আঘাত ভিঙ্ক্‌স্‌নার হাতে এসে পড়লো। আর কিছুই পেত্রাসের মনে নেই। ক্ষতের থেকে রক্ত ছুটতে লাগলো আর সে পড়ে গেল মাটিতে। জেবেস্কা এতে আতঙ্কিত হলেন—তিনি ভাবলেন লোকটাকে তিনি মেরেই ফেলেছেন বুঝি। ক্ষত

সারবার তিন বছর পর পর্যন্তও পেত্রাস তার মগজে ভোঁ-ভোঁ শব্দ শুনতো। জমিদারের নামে নালিশ করতে সে চেয়েছিল, কিন্তু ভেবে চিন্তে সে স্থির করলো— কাজ নেই, কারণ জেবেঙ্কার অর্থবলের জন্যে আদালত তার সপক্ষে রায় দেবে।

সেই শরৎ'এ চাষীদের শস্যদানা ভাগ করে দেবার সময় জেবেঙ্ককা ভিঙ্ক্‌স্‌নাকে তিন মাপ বেশী মটর দিলেন।

মিকুটিস যখন একজনের চুল কাটতে ব্যস্ত, অন্যরা তাদের পালার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে নানা বিষয়ে আলোচনা করতো— অধিকাংশই সেগুলো নানা ধরণের ভয়াবহ ঘটনার কাহিনী। স্কাইস্টুপিস নদীর তীরে যে সব হত্যাকাণ্ড চলেছিল সর্বদাই সে সম্বন্ধে আলোচনা হতো। য়ুরবারকাস্‌ থেকে কয়েক শো লোক ফ্যাসিস্টরা ধরে এনেছিল। একটা গর্তের মধ্যে ছেলেদের ফেলে, নিহত পিতা-মাতার সঙ্গে তাদের জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে বহুকাল জায়গাটা যেন ঠেলে ঠেলে উঠত।

এসব গল্প শোনবার পর প্রদোষে মিকুটিস যখন বাড়ী ফিরে যেতো তার মনে হতো পায়ের তলাকার মাটীটা স্পন্দিত হচ্ছে এবং ফুলে উঠছে আর শিশুদের হাতগুলো যেন মাঠ থেকে ফুঁড়ে উঠছে।

—1004

২

কাগজের একটা টুকরো উড়িয়ে মিকুটিসের এক ছোট ভাই উঠনে দৌড়ে গেল। তার পিছনে ক্ষুদে পা-ওলা বেঁটে একটা কুকুর জলভরা গর্তগুলো লাফিয়ে পার হতে হতে দৌড়চ্ছিল। ব্যাস্ত মুরগিগুলোকে ভয় পাইয়ে গোলা-ঘরের দরজার ভিতর দিয়ে কুকুর আর ছেলেটা দৌড়ে চলে গেল। সেখানে কিন্তু কাউকে না দেখে তারা গেল চালা-ঘরের মধ্যে।

'ওরা কাগজপত্রগুলো এনেছে।'

চালা-ঘরের মধ্যে মিকুটিসকে ছেলেটা দেখতে পেলো। কেবল একটা সার্ট পরে হাঁটু গেড়ে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর সে শুক্‌নো ডালগুলো কাটছিল। কুড়ুলটাকে রেখে জামার আস্তিন দিয়ে তার কপালের ঘাম মুছে কাগজটাকে সে নিলো।

'এটা কে এনেছে?'

তার ভাই বল্‌লো, 'আদোমুকাস।'

শুক্‌নো ডাল-পালায় ছড়ে যাওয়া মিকুটিসের রোগা হাতটা কাঁপতে লাগলো। ধীরে ধীরে কাগজটা সে পড়লো, এমনভাবে ঠোঁট নাড়াতে লাগলো যেন গরম একটা পিঠে সে চিব্বুছে। কুকুরের কর সম্বন্ধে সেটা একটা ইস্তাহার।

প্রায় তিন মাসের জন্যে মিকুটিস ইতিমধ্যে 'কুকুরের খাজনা' দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ-সমস্ত ইস্তাহার খাজনা আপিস থেকে যখন প্রচারিত হতে লাগলো মিকুটিস দেখলো স্থানীয় পুলিশকে ঘুষ দেওয়া তার সাধ্যাতীত। এই দুটো উপায়ের মধ্যে একটা তাকে বেছে নিতে হবে—হয় কুকুরটাকে করতে হবে সমর্পণ কিম্বা লুকিয়ে রাখতে হবে সেটাকে। মিকুটিস মুরজা'কে গোলা-ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখে যখনই কোনো সৈনিক বাড়ীর পাশ দিয়ে হেঁটে যায়।

ছাউনি তলায় তার মা তাকে আবিষ্কার করলো সেই কাগজটা ধরা অবস্থায়।

উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁর পুত্রের দিকে চেয়ে মা তাকে প্রশ্ন করলেন, 'এটা কী রে?'

কুড়ুলটাকে আবার তুলে নিয়ে সে উত্তর দিল, 'এটা কুকুরটার সম্বন্ধে।'

'তোর ঐ কুকুরটার জন্যে জার্মানদের কোপানল আমাদের ওপর তুই এনে ফেলবি। আর এটা একটা এমন কিছু ভালো কুকুরও নয়—এটা শুধু এঁটুলির বংশ বাড়াবে। গোলা-ঘরে একদানা শস্যও যখন ইঁদুরে খুঁজে পায় না তখন এটা কী পাহারা দেবে? আমাদের পরিচিত সবাই তাদের কুকুরগুলোকে মেরে ফেলেছে। তুই দেখিস কুকুরটার

গলায় একটা ফাঁস জড়িয়ে ওটাকে যদি না আমি না ঝুলিয়ে দিই…’

‘মা, এ-কথা তো তুমি আগেও বলেছো।’

‘এবার আমি কথা রাখবো। নিজেকে তুই পুরুষ বলিস অথচ একটা কুকুরকে মারতে পারিস না! মুরজা এদিকে আয়!’

কুকুরটাকে গোয়াল-ঘর থেকে তিনি নিয়ে গেলেন। চালা-ঘরটার কাছে তাঁকে একটা পাত্রে ঠং করে আওয়াজ করতে মিকুটিস শুন্‌লো। কুকুরটার অন্তত শেষ খাবার খাওয়া দরকার। এক মিনিট পরে তার মা কিন্তু শাসানির কথা ভুলে গেলেন এবং কুকুরটাকে লেলিয়ে দিলেন যে-সমস্ত ভেড়া বসন্তকালের শস্যের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাদের ওপর। বাতাসে মুরজার আনন্দধ্বনি শোনা গেল।

মিকুটিস জানতো মুরজাকে কখনো না কখানো মেরে ফেলতেই হবে। কোনোক্রমেই সে অনাবশ্যক জানোয়ারদের হত্যা-করার কর্তব্য এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রয়োজন মত অসুস্থ এবং যে-সব মুরগিরা ডিম পাড়ে না তাদের মাথা সে কেটে উড়িয়ে দিয়েছে। আর যখন একটা ভেড়াকে কাটতে হয়েছে সে তখন কেটেছে। একদা তার মার জানালাগুলো ধোবার সময় হাতে একটা কাঠের টুকরো বিঁধে

গিয়েছিল। তার বাবার ক্ষুর দিয়ে চামড়াটা কেটে কাঠের সেই টুকরোটাকে সে বার করেছিল। এসব কাজ করার জন্যে আর কেউ ছিল না। রক্ত দেখে তার মা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। মুণ্ডহীন মৃত্যুকাতর মুরগিছানাদের দিকে চেয়ে তার ভাইরা কেঁদে এবং আতঙ্কিত হয়ে কোণে গিয়ে মুখ ঢাকতো। এসব ঘটনায় মিকুটিসকে অভ্যস্ত হতে হয়েছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার যথা কর্তব্য সে করতো। কিন্তু কুকুরটার জন্যে সে দুঃখ পেলো। মুরজা আর সে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে। সর্বদাই তাদের বন্ধুত্ব ছিল অটুট। যেদিন তার বাবা বাড়িতে এনেছিলেন একটা কুকুরছানা, সেদিনকার কথাটা ছেলেটার স্পষ্ট মনে পড়ে। তখনো তারা খামারে আসেনি। একটা গ্রামে তারা থাকতো যেখানে ছিল পাথরের একটা দেয়াল এবং পথের ধারে একটা ক্রশ চিহ্ন। সে বছর মিকুটিস অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থতার কথা এইটুকুই শুধু তার মনে পড়ে যে ক্রমাগতই সে কাঁদতো আর ওষুধ খেতে চাইতো না। তার বাবা বলেছিলেন ওষুধ খেলে তাকে একটা কুকুরছানা দেবেন। একদিন বাড়ী ফিরে তাঁর বুকের কাছে চেপে ধরা টুপি থেকে সাদা একটা বলকে মিকুটিসের বিছানার পাশে মেঝেতে রাখলেন। সেই সাদা বলটা গড়িয়ে গেল দেয়ালের পাশে। সেটাই মুরজা।

মিকুটিস তখন ভাবলো এসব ঘটনা এতো আগে ঘটে গেছে যে শুধু সেই কুকুরটাই নয়, সে নিজেও, এত বছর ধরে বেঁচে রয়েছে যেটা গোণা যায় না। ছেলেটা একদা ভেবেছিল যে কখনই সে মুরজা'র কাছ ছাড়া হবে না। ভেবেছিল ঠাকুর্দার মতোই চিরকাল একসঙ্গে তারা থাকবে, —যেমন নদী আর মাঠের ও ধারের লাইম গাছটা।

ফ্যাসিস্টরা কিন্তু চড়াও করলো আর অকস্মাৎ মানুষ, জন্তু-জানোয়ার এবং প্রিয় জিনিসগুলো উধাও হতে সুরু করলো। ঠাকুর্দা মারা গেলেন আর সেই লাইম গাছটা, যেটার পাশ দিয়ে ছেলেরা ছুটে যেতো নদীর দিকে—সেটাও কেটে ফেলা হলো। এমন কি যে-সব বড় বড় পাথরের ওপর রাখাল-বালকরা খেলনার পিঠে বানাতো, সেগুলোও ভেঙে তারা নিয়ে গেল। অদৃশ্য হলো মিকুটিসের বাবা।

চালা-ঘরে কাজ করার সময় গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে মিকুটিস আবিষ্কার করলো যে সে কুকুরটার জন্যে তখন আর অতোটা দুঃখ বোধ করছে না।

সন্ধ্যের দিকে একটা দড়ি বার করে মুরজাকে শিশ দিয়ে সে ডাকলো। তার ভাইরা শুন্‌লো তাকে তার মার সঙ্গে কথা কইতে আর দেখলো দড়িটা তাকে খুঁজতে। সবাই তারা

বুঝলো। দৌড়ে কুটীর থেকে সবাই বেরিয়ে নিঃশব্দে মুরজার শেষ যাত্রা দেখতে লাগলো। কুকুরটা মিকুটিসের পিছন পিছন ছুটতে লাগলো, কখনো ঘাসে মুখ ডুবিয়ে, কখনো বা তার প্রভুর পিছন পিছন দৌড়ে— প্রতি মুহূর্তে ঢিবিগুলোর কাছে থেমে থেমে। এক জায়গায় সেটা চম্‌কে দিল একটা পাখীকে যেটা তারস্বরে চিৎকার করতে করতে অন্ধকার মাঠের উপর উড়তে লাগলো। তাদের পিছনে পিছনে বিছিয়ে এলো দীর্ঘ অন্ধকার ছায়া।

চাষীদের মত বড় বড় ভারি পা ফেলে ছেলেটা হাঁটতে সুরু করলো। মালিকের দৃষ্টি নিয়ে মাঠগুলো সে পার হলো, ক্বচিৎ ভাবছিল কুকুরটার কথা।

বসন্তকালের জন্যে যে গম সে বুনেছিল সেগুলো খাপছাড়া ভাবে জন্মালো— মাঝে মাঝে ফাঁকা রয়ে গেল মাঠ। তার মা'য়ের কথা মিকুটিসের মনে পড়লো: 'তোর চাষের জন্যে আমাদের আর রুটি মিলবে না…' যেদিকেই সে চায় সেদিকই বন্ধ্যা মাঠ; আগের মতো পশুর পাল আর নেই। অন্ধ ঘোটকীটাকে পেরিয়ে গেল মিকুটিস আর কুকুরটা। সমস্ত দিন ধরে ঘাস মাড়িয়ে আর দাঁতে কেটে নিজের চারপাশে একটা বৃত্ত সে বানিয়েছিল। মিকুটিস ভাবলো ঘাস ভরা অন্য কোনো জায়গায় তাকে বাঁধতে হবে। যেন গভীর

চিন্তায় মগ্ন হয়ে সেটা দাঁড়িয়েছিল— অস্তগামী সূর্যের দিকে ঝুলে পড়েছিল তার মাথাটা। কখনো কখনো মাছি তাড়াবার জন্যে লাথি ছোঁড়ায় তার শেকলটা ঝনঝন করে উঠছিল। দীর্ঘ বুনো ঘাসে ভরা শুক্‌নো এক ছোট্ট নদীর কাছে ছেলেটা থামলো। এখানে মাটির তলার জল বেশী গভীর নয়। শণ ভেজাবার জন্যে এখানে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। মাঝে মাঝে এখানে শূয়োরের নাড়ি-ভুঁড়ি ধোবার কিম্বা বেড়াল বাচ্চাগুলোকে ডুবিয়ে মারার জন্যে লোকজন আসে। একটা ভালো মতো পাথর খুঁজতে লাগলো মিকুটিস আর অকস্মাৎ সে আবিষ্কার করলো কুকুরটা তার পাশে নেই। একটা গম ক্ষেতের পাশে স্রোতের তীরে সেটা বসেছিল। তার প্রভুর ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই সে লাফিয়ে উঠলো কিন্তু তারপর উবু হয়ে রইলো আবার বসে। আবার ডাকলো মিকুটিস, আবার মুরজা উবু হয়ে বসে মাটি আঁচড়ে চললো। মিকুটিস চেঁচিয়ে বললো, 'চলে আয় বোকাটা।'

কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে উঠে ল্যাজ নাড়িয়ে বারকতক এমন ভাব দেখালো যেন সে তার প্রভুর কাছে যেতে চায়। কুকুরটা কি তার বিপদ অনুভব করেছিল? দড়িটায় মিকুটিস যে পাথরটা বেঁধেছিল সেটা দেখে সে কি বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা? ছেলেটা পাথরটা ফেলে দিয়ে, বসে পড়ে

অকস্মাৎ ভাবলো যে তিন বছর আগে কে একটা রাখাল ছেলে মুরজাকে ধরে ঠিক এই গর্তের মধ্যেই ফেলে দিয়েছিল। জলে পড়ে গিয়েছিল কুকুরটা আর ভেসে উঠে হাঁকপাঁক করে তীরে উঠতে চেষ্টা করার সময় ছেলের দল গর্তটার কাছে ভিড় করে নির্দয়ভাবে তাকে ঠেলে দিচ্ছিল। কুকুরটা করুণ স্বরে কেঁউ কেঁউ করছিল, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। কেবল যখন সে বেশ খানিকটা জল গিলেছিল আর এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে তার কম্পিত থাবা দিয়ে গর্তটার পাশটা ধরতে পারছিল না তখন কে একজন তার ঘাড়টা ধরে ছুঁড়ে দিয়েছিল তাকে মাঠের ওপর।

সেদিন থেকে এই গর্তটা দেখলেই কুকুরটা ভয় পেতো।

মুরজাকে মিকুটিস আর ডাকলো না।

সমস্তদিন সে কাটালো ক্ষেতে সার ছড়িয়ে আর কাঠ কেটে। সন্ধ্যে নাগাদ সে ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তার হাত আর পিঠটা ব্যথা করতে লাগলো। কিন্তু যে চিন্তা তাকে পীড়া দিচ্ছিল সেটা আরো কষ্টকর।

'ওরে আমার মুরজা!' মৃদু স্বরে ছেলেটা ডাকলো। সে কেবল চাইছিল কুকুরটার পিঠে হাত বোলাতে।

মিকুটিস শুয়ে পড়লো ঘাসের ওপর। সে দেখলো অনেক ওপরে আকাশে একটা বাজপাখী উড়ছে আর অনুভব করলো তার চতুর্দিকে সব কিছুই ফাঁকা আর নিরানন্দময়। শত্রুরা মানুষ আর জানোয়ার হত্যা করছে, পাহাড় আর অরণ্য করছে ধ্বংস। হত্যা করার আদেশ তারা দিচ্ছে—মারতে বলছে সেই সব কুকুরদেরও কোনো দিন যারা কারো কোনো অনিষ্ট করেনি। তা নাহলেই একটা মোটা খাজনা দিতে হবে। মিকুটিস ভাবলো, 'কোথা থেকে টাকাগুলো আসবে?'

অকস্মাৎ ছেলেটার মনে হলো সে বড় হয়ে উঠেছে—প্রকাণ্ড আর শক্তিশালী; সে দেখলো গোয়ালের মধ্যেকার কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরি তার বানানো জাহাজটাকে, দেখলো বিরাট সেই বন্দুককে, যেটা গ্রামের কামার তাকে বানিয়ে দিয়েছে সারা গ্রাম থেকে কুড়োনো লোহাগুলো দিয়ে। মিকুটিস কল্পনা করলো যেন সে সেই জাহাজে গ্রামের সমস্ত লোক, মুরজা আর য়ুয়োজাস খুড়োকে তুলে নিয়েছে; যাত্রার জন্যে তারা এনেছে বন্দুক, কিছু রুটি আর ঝল্‌সানো একটা শূয়োরের মাংস—চলেছে তারা শত্রুর সঙ্গে লড়তে।

কুকুরটার সাহস আরও বেড়ে উঠলো। সাবধানে গর্তটা পার হয়ে মাটির ওপর শুয়ে-থাকা তার বন্ধুর কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো, শুঁকলো তার পা আর শুয়ে পড়লো তার পাশে। দেখতে দেখতে সেটাও চোখ বুঁজলো, আর মাঝে মাঝে সে যখন চোখ খুলতে লাগলো, দেখতে পেলো একটা মেঘ, অস্তগামী সূর্য যেটাকে রাঙিয়ে তুলেছে, আর যেটা ভেসে চলেছে আকাশ দিয়ে। মেঘটাকে অনেকটা মিকুটিসের চমৎকার জাহাজটার মত দেখাচ্ছিল।

গোপন খবর

স্টেপুকাস অনেক কিছুই জানতো। যদিও গুল্‌বিস জানাস নৌকো করে দ্বীপটাতে যাবার সময় তাকে সঙ্গে নিতো না তবুও সে ভালো করেই জানতো যে জানাস সেখানে চেরি পাতায় ভরা পাইপ টানে। জঙ্গলে খরগোস ধরার ফাঁদ পাতার জন্যে মাতব্বর মাতুলিসের ছেলেরা তাকে না ডাকলেও সে তোয়াক্কা করতো না — তারা কী যে করবে

সব কিছুই সে জানতো। ফাঁদগুলোকে সে কেয়ার করতো না — শেয়ালের গর্ত এবং এমন অনেক কথা সে জানতো যার বিষয়ে আলোচনা করাও বিপজ্জনক। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে সবাই জানে শিভা'কে খোঁড়া বলে, আসলে কিন্তু ঘোটকীটা সম্পূর্ণ সুস্থ — কেবল তার বাঁ পায়ের খুরের সবচেয়ে নরম জায়গায় একটা পেরেক ফোটানো হয়েছে। জন্তুটাকে পঙ্গু করার জন্যে ইচ্ছে করেই পেরেকটা ফোটানো হয়েছিল। তাদের গ্রামে ফ্যাসিস্টরা যখন আসে তখন স্টেপ্‌কাসের বাবা এই পেরেকটা ফুটিয়ে ছিলেন। সে কারণেই সৈনিকরা ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়েছিল। খোঁড়া ঘোড়ার প্রয়োজন তাদের নেই। ঠাকুর্দা পুরোনো খড়খড়ি দিয়ে যে খাঁচাটা বানিয়েছিলেন সেটাও ছিল। কে ধারণা করতে পারে যে সেই খাঁচাটার তলায়, বাসাগুলোর নীচে ছিল — কিন্তু সেখানে কি যে ছিল সে কথা জানার তোমার কী দরকার? ফ্যাসিস্টদের কাছ্ থেকে সেটা লুকোনো হয়েছিল, তোমার কাছ্ থেকে না।

বাস্তবিকই স্টেপ্‌কাস'এর পেটে লুকিয়েছিল অনেক গোপন খবর। সে কিন্তু সে সব বিষয়ে কখনো আলোচনা করতো না — তাকে দস্তার বোতাম, জুতোর কালির খালি টিন, পেনসিল কাটা ছুরি কিম্বা এক মুঠো মিছরি দিলেও না।

তার বৃহৎ জ্ঞান-ভাণ্ডারে একদিন নতুন একটি গোপন খবর জমা হলো—ভবিষ্যতে সে উপলব্ধি করেছিল সেটাকে সবচেয়ে বড় খবর বলে। প্রথমে, এমন কি, স্টেপুকাস বুঝতেই পারেনি যে সেটা একটা গুপ্ত কথা। প্রতিবার তার বাবার খামারে যাওয়া নিয়ে কেন সে মাথা ঘামাবে? জন্তুদের খড় দিতে কিম্বা গম বীজ ঝাড়ার জন্যে বরাবরই তিনি খামারে গিয়ে থাকেন—এটা সে জানে। এখন শুধু সে অবাক হয় কেন তার বাবা এক বাটি ঝোল আর এক টুক্রো রুটি তাঁর কোটের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে যান। সেটা তিনি নিয়ে যেতে পারেন বটে ভেড়া কিম্বা শুয়োরছানার জন্যে। কিম্বা মুরগিদের জন্যে। কিন্তু কেন তিনি চামচে নিয়ে যান? স্টেপুকাস ভালো করেই জানে যে মুরগি কিম্বা ভেড়া কিম্বা শুয়োরছানা চামচে দিয়ে খায় না। তার বাবা খামারে যে ঝোল নিয়ে যান শুধু সে কারণেই ছেলেটা চিন্তিত হয়নি। স্টেপুকাস একদিন দেখলো তাঁকে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া নিয়ে আসতে; সেটায় কিন্তু রক্তের দাগ! ভয় পেয়ে তার মা চতুর্দিকে চেয়ে তৎক্ষণাৎ সেটাকে কাপড় ধোবার গামলায় ছুঁড়ে ফেললেন।

'ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন! এটা নিয়ে দ্বিতীয় সার্ট আমি কুটি কুটি করে ফেলেছি। অবস্থা কি এখনো খুব খারাপ?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'একটু ভালোর দিকে গেছে। কনুইতে ছাল গজাচ্ছে। আজ সে পূরো খাবার খেয়েছে আর তার চোখে দেখা দিয়েছে উজ্জ্বলতর জ্যোতি। এমন কি সে উঠে দাঁড়াতে চাইছিল — কিন্তু আমাদের ভাষা না জানলে কোথায়ই বা সে যেতে পারে?'

'রাতে এখনো ঠাণ্ডা। তোমার ভেড়ার লোমের কোটটা তাকে দেবে কি?' স্টেপুকাস'এর মা উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলেন।

'আমি তো দিতে চেয়েছিলাম। সে কিন্তু নিতে চায় না: বলে খড়ের গাদাটাই যথেষ্ট গরম।'

উত্তেজনায় স্টেপুকাসের প্রায় কণ্ঠ-রোধ হয়ে এলো। কিন্তু কার সম্বন্ধে তার বাবা-মা কথা বলছেন সেটা সে বুঝতে পারলো না। প্রথমে সে ভেবেছিল ভেড়া সম্বন্ধে, তারপর মনে হলো তাঁদের খামারে রাত্রি যাপনকারী কোনো অতিথির বিষয়ে কথা বলছেন। খুব সম্ভব হয়তো রিমজুইস'এর কাছ থেকে কেনা বাছুরটার সম্বন্ধে আলোচনা করছেন তাঁরা··· কিন্তু কোথা থেকে এলো সেই ছেঁড়া ন্যাকড়াটা, আর কেনই বা ইতিমধ্যে তার মা দুটো সার্ট ছিঁড়ে ফেললেন? হয়তো বা ঘোড়ার বাচ্চাটার মতো বাছুরটাও তার খুরটা জখম করেছে।

তার নতুন গুপ্ত খবর নিয়ে স্টেপুকাস মাথা ঘামাতে লাগলো। অনেকবার ছেলেটা চেয়েছিল তার বাবা যেন তাকে খামারে নিয়ে যান।

'তোর নাকটা জমে যাবে—বাড়ী যা।'

একবার এ-পায়ে আর একবার ও-পায়ে লাফাতে লাফাতে স্টেপুকাস্ অনুনয় করে বললো, 'আমার শীত করছে না। বাছুরটাকে দেখতে চাই।'

'শুনেছিস, তোকে কী বল্‌লাম—বাড়ী যা। তুই কী বেল্টের বাড়ি খেতে চাস?'

এই বেল্টের বাড়ির কথাটাই সবচেয়ে ভয়ের—সেটা শোনার পর স্টেপুকাস আর উৎসাহ দেখাতে ভরসা পায় না। খামারে যাবার সময় আজ তার বাবা আবার সেই মারের ভয় দেখিয়েছেন—আর তারপর কয়েক পা এগিয়ে উঠোনের মধ্যে দাঁড়ানো স্টেপুকাসকে তিনি চেঁচিয়ে বলেছেন:

'খামারে গিয়ে একবার দেখিস! লেপ্‌স্নামারে তোর জন্যে অনেকদিন ধরে চালাঘরে ওৎ পেতে রয়েছে।'

গ্রামের ছেলেমেয়েদের কাছে লেপ্‌স্নামারে একেবারে জুজুর মতন। ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাবার জন্যে মায়েরা তার কথা বলতেন। দীর্ঘ আর বিশীর্ণ সেই মহিলা—মুখটা তার এতো লালচে যে মনে হতো যেন কেউ ছাল ছাড়িয়ে

নিয়েছে। অন্যদের মত লেপ্স্নামারেকে হাঁটতে কেউ কখনো দেখেনি। সর্বদাই সে লাফিয়ে চলতো এবং বাড়ী, গাছ আর পাথরগুলোর উদ্দেশ্যে ক্রশ চিহ্ন আঁকতো। লোকদের পাগলীটা কাতুকুতু দিয়ে মারতে পারে বলেও একটা গল্প চালু ছিল। শোনা যায় টুরভালাক মাঠে একদা এক রাখাল ছেলেকে ধরে সে কাতুকুতু দিয়ে আদর করে চুমু খেয়ে চলেছিল যতক্ষণ না সে মারা যায়। ছাগল, কুকুর এমন কি লুল হ্রদের শিট মাছকেও স্টেপুকাস ভয় পেতো না, কিন্তু লেপস্নামারেকে ভয় পেতো। বাবা বলেছিলেন যে লেপস্নামারে চালাঘরে বসে আছে তাই কথাটা বিশ্বাস করা যায়। মায়ের বেলা কিন্তু আলাদা কথা। সর্বদাই তিনি বেদের দল কিম্বা কুমীরের কথা বলে ভয় দেখাতেন। তিনি বলতেন কুমীরগুলো নেমানে থাকে, কিন্তু স্টেপুকাস ভালো করেই জানে যে এই নদীটায় কোনো কুমীর নেই। তাকে শুধু ভয় দেখাবার জন্যে তার বাবা কোনো কিছুর উল্লেখ করতেন না। তাই মনে হয় কোনো কারণ না থাকলে লেপ্স্নামারের উল্লেখ করতেন না তিনি··· কিন্তু চালাঘরে লেপস্নামারে কেন বসে আছে? হয়তো তার কোনো বাড়ী নেই আর ছেলেদের কাতুকুতু দেয় বলে কেউ তাকে খাবার দেয় না। কিন্তু কোথা থেকে রক্তের দাগ

লাগা ন্যাকড়াগুলো আসছে? লেপ্‌স্নামারেকে কি কুকুরে কাম্‌ড়েছে?

লেপ্‌স্নামারেকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলো না স্টেপুকাস। এমন কি স্বপ্নে সে দেখলো তাকে গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে—দাঁড়কাকের মতো কালো, কুচ্‌কুচে কয়লার মতো ছেঁড়া কাপড়টা ছড়িয়ে পড়েছে। সন্ধ্যেবেলা এখন উঠোনে যেতে হলে স্টেপুকাস তার মাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর আঁচল ধরে যায়। বড়দের কাছে শোনা ভয়াবহ ফ্যাসিস্টদের কথা, যারা সাঁড়াশি দিয়ে মানুষের জিভ উপড়ে ফেলে, আর চাষীদের ফাঁসি দেয় বুরবিন প্রান্তরে এবং এই লেপ্‌স্নামারের গল্পে ছেলেটা আতঙ্কে শিউরে ওঠে। এক সন্ধ্যায় জানালার পাশে বসে স্টেপুকাস অন্ধকারের দিকে এমন স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল যে তার মনে হলো, যে খামারে লেপ্‌স্নামারে থাকে সেটা নড়তে সুরু করে যেন কাছে এগিয়ে আসছে।

'মা!' বলে আতঙ্কে চিৎকার করে ছেলেটা দৌড়ে তার মা'র কাছে গেল।

'কী হয়েছে মানিক? কী দেখে ভয় পেলি? নিশ্চয়ই ঢুল্‌তে ঢুলতে কিছু একটা স্বপ্ন দেখেছিস। শুয়ে পড় গে যা, সোনা আমার।'

এ্যাস্‌পেন পাতার মতো কাঁপতে লাগলো স্টেপুকাস। সামলে উঠে তার স্বীকার করতে লজ্জা হলো যে কাল্পনিক এক ভয় সে পেয়েছে। এমন কি রাত্রির খাবার না খেয়েই সে শুতে গেল তার বাবার জন্যে অপেক্ষা না করে—যে কোনো মুহূর্তেই তিনি ফিরতে পারেন। জেগে উঠে মিট্‌মিট্‌ করে সে তাকালো। পাছে লেপ্‌স্নামারেকে স্বপ্নে সে দেখে, এই ভয়ে ঘুম তার পালিয়েছে।

কাপড় সেলাই করতে করতে বিছানায় তার পায়ের কাছে মা বসেছিলেন। আর তার বাবা, নিশ্চয়ই সবে ফিরে, আগুনের পাশে বসে মোটা ন্যাকড়াগুলো টেনে বার করছিলেন—সেগুলোকে তিনি মোজা হিসাবে ব্যবহার করতেন।

'বারবার আমি জামার এই আস্তরটা ধুয়েছি আর ঘষেছি কিন্তু তবু এখানে রক্ত লেগে রয়েছে। গভীর বনে কে সেলাই করবে এই ভেবে তার পোষাকটাকে আমি এখন সেলাই করছি। চোখ জলে ভরে গেছে বলে ছুঁচটাকে দেখতে পাচ্ছি না,' স্টেপুকাসের মা বলছিলেন।

'সে বলছিল নদীটা জমে গেলেই ওপারে চলে যাবে, কারালিশ জঙ্গলে তার পৌঁছনো দরকার। সেখানে বন্ধুদের দেখা পাবে বলে সে নিশ্চিত। কিং করে সে আহত

হয়েছে আর কি করেই বা বন্ধুদের কাছ ছাড়া হয়েছে সে গল্প আমাকে সে বলেছে। আবার তাকে আমাদের বাড়ীতে আসতে বলেছিলাম, বলেছিলাম তাহলে সে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারবে। সে কিন্তু বলে—না, বলে তাকে কেউ দেখতে না পাওয়াই ভালো। বলে, ভালো লোকদের অনিষ্ট সে করতে চায় না। সে বলে ফ্যাসিস্টরা যদি জানতে পারে যে তোমরা আমাকে লুকিয়ে রেখেছো তাহলে, তোমাদের বাড়ী তারা পোড়াবে আর তোমাদের সবাইকে যন্ত্রণা দিয়ে মারবে—শেষ শিশুটিকে পর্যন্ত…'

'ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন!' নিজের এবং দেয়ালের উপর স্টেপুকাসের মা ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন।

টুপির ভেতর ফেলে সে তার কার্তুজগুলো গুনে বললো: "ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে আমরা বোঝা পড়া করবো; সীসে দিয়ে আমরা সব কিছু শোধ তুলবো," স্টেপুকাসের বাবা বলে চললেন।

'তুমি কি জিগ্‌গেস করেছিলে, বাড়ীতে তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে আছে কি না? তার জন্যে একটা সার্ট আর পায়ের গরম কাপড় সেলাই করবো বলে ভাবছি।'

তার বাবা-মা যে সব কথা বলছিলেন তার সব

কিছুই স্টেপুকাস বুঝতে পারলো না, কিন্তু সে অনুভব করলো যে তাঁদের কথাবার্তা বাছুর কিম্বা লেপ্স্নামারেকে নিয়ে একেবারেই নয়। স্পষ্টতই তাঁরা এক আহত মানুষ সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, যাকে তাঁরা খামারে লুকিয়ে রেখেছেন। খড়ের গাদায় শুয়ে থাকা এই মানুষটিকে স্টেপুকাস কল্পনা করতে লাগলো আর কী জানি কেন মনে হলো তাকে দেখতে ভিক্টর স্টুলগিস'এর মতো, যে তাকে গ্রীষ্মকালে উঁচু খড়ের গাড়ীতে চড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। তাকে সে কল্পনা করলো ভিক্টরের মতো ডোরাকাটা ফতুয়া পরে খড়ের গাদায় শুয়ে থাকতে, কেবল তার ফতুয়াটা গুলিতে ঝাঁঝরা।

রাত্রে অকস্মাৎ দারুণ ঠাণ্ডা পড়লো আর সকালে জলা জমিটা শীতের প্রথম চক্চকে বরফে ঢেকে গেল। স্টেপুকাস ভুলে গেল তার সমস্ত গোপন কথা: খানা, ডোবা আর মাঠের উপর বরফটাকে দেখাতে লাগলো তাজা দুধের মতো সাদা আর মসৃণ। মিলের বাঁধটায় ইতিমধ্যেই ছেলের দল ঝেঁকে এসেছে। কখনো তারা জমায়েত হয়ে তারস্বরে দল পাকায়, কখনো বা বরফের ওপর মটরদানার মতো ছড়িয়ে পড়ে। ছোট ছোট অগ্নিশিখার মতো তাদের স্কেটগুলো রৌদ্রে ঝলসে ওঠে।

স্টেপুকাসও তার মার কাছে অনুমতি চাইলো নদীতে স্কেট করতে যাওয়ার।

'যা, দৌড়ো, নিজেই শুধু স্কেট করবি, মাতব্বরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলিস না। তুই তো জানিস তারা তাদের বাপের মতো, একটা পয়সার জন্যে মানুষকে বিক্রী করতে পারে!' তার মা সাবধান করে দিলেন।

'আমি একলাই স্কেট করবো মা। নদীর এপাশে, গর্তটার ধারে,' ছেলেটি কথা দিল।

ডান পায়ে স্টেপুকাস স্কেটটা বাঁধলো আর বাঁ পা'য়ের জুতোর গোড়ালিতে পুঁতলো একটা পেরেক যাতে ঠেলা দিতে সুবিধে হয়। ঠেলা দিল সে, আর বোঝবার আগেই নদীর কাছে এসে পড়লো। চমৎকার এখানটা, নদীর উঁচু পাড় বাতাস আট্‌কে রেখেছে, আর এতো বড়ো জায়গা জুড়ে বরফ রয়েছে যে স্টেপুকাস প্রাণ ভরে স্কেট করতে পারে। প্রথমে সে ঠিক করেছিল নদীর তীরের কাছেই শুধু স্কেট করবে। পরে কিন্তু নদী ধরে এবং নদী পার হয়ে সে স্কেট করতে লাগলো আর বরফ একটুও ফাট্‌লো না। কিছু পরে হঠাৎ সামনে সে দেখলো মাতব্বরের ছেলেদের। তারা মিলের বাঁধ থেকে নদীর ওপর দিয়ে স্কেট করে এসেছে। স্টেপুকাসের এতো ভালো

লাগছিল যে তার মায়ের সাবধান বাণী ভুলে গেল। তাছাড়া কত এখানে দেখার আছে: মাতুলিসের বড় ছেলে প্রুন্সে'র ফিতেওলা আসল ইস্পাতের এক জোড়া স্কেট; সেটায় লাঠি কিম্বা দড়ির দরকার হয় না। ও রকমটি স্টেপুকাস কখনো দেখেনি। জলের পোকার মতো পা ফাঁক করে বরফের ওপর প্রুন্সে্ এতো দ্রুত ছুটছিল যে কেউই তার নাগাল পাচ্ছিল না। এক পা কিম্বা দু'পা দিয়েই সে স্কেট করতে পারে, সহজে, হাঁটু নাড়িয়ে পরিবর্তন করতে পারে দিক। স্টেপুকাসকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখে প্রুন্সে চেঁচিয়ে উঠলো:

'আমি যা করবো তুইও যদি তা করতে পারিস তো আমার স্কেট জোড়া তোকে দিয়ে দেবো।' তারপর সামান্য ছুটে সে ঘুরে দাঁড়ালো এবং পিছু হটে স্কেট করতে লাগলো।

প্রুন্সে'র দুই ভাই, যাদের একটা করে ইস্পাতের স্কেট ছিল, তাকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করলো। তাদের হাঁটু মুড়ে ছোট ছোট বৃত্তে স্কেট করতে করতে তারা স্টেপুকাসকে চেঁচিয়ে বল্‌লো:

'এ-রকম করে স্কেট করলে তোকে একটা হারমোনিকা দেবো!'

'ওর খড়মটা দিয়ে এ রকম কি করে করতে পারে

দেখতে ইচ্ছে করে। দ্যাখ, দ্যাখ জুতোয় আবার একটা পেরেক গেঁথেছে—বরফ নষ্ট করার জন্যে,' উপহাস করে প্রুন্‌সে বল্‌লো, পকেট থেকে এক মুঠো মটর বার করে মুখে ফেলতে ফেলতে।

অপমানিত আর লজ্জিত হয়ে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে স্টেপুকাস অনেকক্ষণ ধরে মাতব্বরের ছেলেদের লক্ষ্য করতে লাগলো।

'দ্যাখ, দ্যাখ, ভিখিরিদের মতো কাপড় দিয়ে ও পা জড়িয়েছে!' তীরের মত তার পাশ দিয়ে ছুটে যেতে যেতে খোঁটা দিয়ে প্রুন্‌সে বল্‌লো।

স্টেপুকাসের আর সহ্য হলো না।

সে বল্‌লো, 'আমার বাবা এর চেয়ে ভালো স্কেট তৈরী করে দেবেন।'

'বাজে বকিস না। তোর বাবা কিছুই বানাতে পারে না। আমাদের বাবা আমরা যা-চাই বানিয়ে দিতে পারে।' ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটা বল্‌লো।

স্টেপুকাস দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলো, 'আমার বাবা পেতলের বাঁশি আর বন্দুকও বানাতে পারে।'

'তোর বাবাকে বলিস হয়তো তোর নাক পরিষ্কার করার জন্যে একটা হুক সে বানিয়ে দিতে পারবে। লম্বা বরফের

মতো তোর নাকের পোঁটাটা ঝুলে আছে দ্যাখ!’ চেঁচিয়ে ফ্রুন্‌সে বল্‌লো আর স্টেপুকাসের পাশ দিয়ে দ্রুত বেগে যেতে যেতে এমন জোরে তাকে ধাক্কা দিলো যে ছেলেটা তার হাত-দুটো প্রসারিত করে ওপর দিকে কাঠের স্কেটটা ছুঁড়ে বরফের ওপর চিতপাত হয়ে পড়লো।

হাসিতে ফেটে পড়লো মাতব্বরের ছেলেরা। স্টেপুকাস উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝগড়াটে ছেলের দল আবার ঠেলে ফেললো তাকে। কিন্তু কোনোক্রমে হামা দিয়ে বরফের জায়গা থেকে সে সরে গেল। গা থেকে তুষার ঝেড়ে ফেলে সে বল্‌লো:

‘কিন্তু আমি এমন একটা খবর জানি যেটা কেউ তোরা জানিস না। আমাদের খামারে এমন একটা জিনিস আছে যার কথা কিছু জানিস না তোরা। যদি তোদের বলি তাহলে তোদের সব কিছু আমাকে দিয়ে দিবি—হারমোনিকা, তোদের স্কেট, আর তোদের সব পায়রাগুলো। জানিস! কিন্তু আমি বল্‌বো না।’

সঙ্গে সঙ্গে মাতব্বরের ছেলেদের কান খাড়া হয়ে উঠলো। খবরটা জানবার জন্যে তাদের কৌতূহল হলো। স্টেপুকাসের কাছ পর্যন্ত স্কেট করে এসে ফ্রুন্‌সে একেবারে আলাদা সুরে প্রশ্ন করলো:

'তোদের খামারে কী আছে রে?'

'তা আমি বল্‌বো না।'

'মেজাজ দেখাচ্ছিস্ কেন? তুই কি চাস যে আমার স্কেট জোড়া খুলে তোর যতক্ষণ ইচ্ছে ততক্ষণ দিয়ে দিই? পুরো এক ঘণ্টার জন্যে। কী আছে বল।'

'কিছুতেই বল্‌বো না।'

'কিছুতেই বল্‌বি না?'

'না।'

'যদি তোকে এক জোড়ো হল্‌দে পায়রা দিই?'

'তাহলেও বল্‌বো না।'

'কিম্বা একটা ছবির বই?'

'না।'

স্টেপুকাস পালিয়ে যেতে চাইলো, কিন্তু গ্রুন্‌সে তার হাত ধরে মোচড়াতে লাগলো আঙুলটা। যন্ত্রণায় স্টেপুকাসের মাথা ঘুরতে লাগলো। গ্রুন্‌সে'র মুখটা রাগে বিকৃত হতে দেখে কেবল তখনই সে বুঝতে পারলো যে সে এক নিষ্ঠুর আর দয়ামায়াহীন শত্রুর হাতে পড়েছে, কোনো রকম কাকুতি-মিনতিতেই সে মুক্তি পাবে না। সর্বান্তঃকরণে সে চাইলো যেন খামারের বিষয়ে কিছুই সে না বলে। মুহূর্তের জন্যে কল্পনায় সে দেখলো লোকটাকে খামারের খড়ের গাদায় শুয়ে থাকতে,

তারপর বুরবিনের পোড়ো মাঠে চাষীদের ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে। ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠলো।

'আমাদের বল্‌বি, না বল্‌বি না?' স্টেপুকাসকে মাটিতে ফেলে তার হাত মোচড়াতে মোচড়াতে প্রুন্‌সে চিৎকার করে উঠলো। স্টেপুকাসের বুকে হাঁটু দিয়ে এতো জোরে সে চাপ দিতে লাগলো যে বেচারা হাঁপাতে লাগলো নিশ্বেস নেবার জন্যে।

যখন সে আর সহ্য করতে পারলো না, স্টেপুকাস কেঁদে চেঁচিয়ে বল্‌লো:

'আমাকে ছেড়ে দে। আমি বলবো।'

এই যন্ত্রণা থেকে এক মুহূর্তের জন্যে মুক্তি পেতে সে চাইছিল। তারপর মরতেও সে ভয় পায় না। প্রুন্‌সে তাকে ছেড়ে দিল।

'সেটা একটা খরগোস', প্রথম তার মাথায় যা এলো তাই বললো স্টেপুকাস।

তাইতে সে বেঁচে গেল।

'কী খরগোস? জ্যান্ত না মরা?' চট করে প্রশ্ন করলো প্রুন্‌সে।

'মরা।' কী যে বলছে স্টেপুকাস নিজেই সেটা ভালো করে জানে না।

মাটি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলো ফ্রুন্সে, তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো মটর মুখে ফেললো। স্টেপুকাসের দিকে চেয়ে সে চিবুতে লাগলো, চিবুতে লাগলো আর চেয়ে রইলো। তার দুই ভাই পাশে দাঁড়িয়ে রইলো তার।

'এখন বুঝতে পেরেছি', ফ্রুন্সে অবশেষে বল্লো, 'এখন বুঝেছি ঝোপের মধ্যে আমরা যে ফাঁদ পেতেছিলাম কে সেটা থেকে চুরি করেছে। তুই চুরি করেছিলি, নয়?'

'হ্যাঁ,' ফ্রুন্সে'র রাগকে একটুও ভয় না পেয়ে স্টেপুকাস উত্তর দিলো। খামারের সেই অতি গোপনীয় খবরের জন্যে কাল্পনিক অপরাধ সে স্বীকার করলো।

'কতগুলো খরগোস ফাঁদটার মধ্যে ছিল?' ফ্রুন্সে আবার প্রশ্ন করলো, ভীষণ ভাবে স্টেপুকাসের মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে।

'একটা,' শান্ত স্বরে ছেলেটি উত্তর দিল আর তারপর ধীরে ধীরে কনুই দিয়ে ঢাকলো তার মুখ।

'তুই মিথ্যে বলছিস, চোর কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠলো ফ্রুন্সে আর তারপর স্টেপুকাসের পাঁজরে ঘুষি মারলো। পাঁজরটা চেপে ধরে দুমড়ে খাবি খেতে লাগলো স্টেপুকাস, কিন্তু পড়ে গেল না। ফ্রুন্সের দ্বিতীয় ঘুঁষি পড়লো তার থুৎনিতে। এবার ছেলেটি পড়ে গেল, বরফে ঠুকলো

তার মাথার পেছন দিক। তার মনে হলো সূর্যের ওপর কে যেন একটা রুমাল চাপা দিয়ে দিয়েছে; সে দেখতে পেলো যেন তার চোখের সামনে কালো কালো ফুটকি নাচছে আর তারপর সবকিছুই হয়ে গেল একেবারে অন্ধকার।

স্টেপুকাসের জ্ঞান হলো যখন কাছাকাছি কেউই ছিল না··· স্কেটের আঁচড় লাগা বরফ এতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল যে চাইলে চোখে লাগে। ছেলেটি মাথা তুল্‌লো আর সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ এক যন্ত্রণা তার শরীরের মধ্যে বয়ে গেল। তার ঠোঁটের কোণ থেকে অল্প অল্প রক্ত ঝরতে লাগলো। কেবল একটি চোখে সে দেখতে পাচ্ছে। ওঠবার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু আবার পড়ে গেল বরফের উপর। গলা ছেড়ে করুণভাবে সে কাঁদতে লাগলো। সে কল্পনা করলো এখানকার বরফের ওপর সে মরে যাচ্ছে আর দাঁড়কাকরা ঠুকরে বার করছে তার চোখ। কিন্তু এই কল্পনাই তাকে জোর দিল আর সে হামা টেনে চললো।

ছেলেটির মনে নেই কী করে সে বাড়ী পৌঁছুলো কিম্বা তার মা'র সঙ্গে কী করে দেখা হলো। শুধু তার মনে আছে যে যখন তার জামাকাপড় ছাড়িয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হচ্ছিল বারবার সে শুধু বলছিল:

'মা আমি স্কেট করছিলাম, স্কেট করছিলাম, স্কেট করছিলাম আর…'

'আর পড়ে গিয়েছিলি, আমার মানিক,' তার মা কথাটা জুগিয়ে দিলেন।

'আর পড়ে গিয়েছিলাম,' খুসী হয়ে স্টেপুকাস বললো। যে কথাটা খুঁজে পাবার অমন কঠিন সে চেষ্টা করছিল সে কথাটা যেন তাকে জুগিয়ে দেওয়া হলো।

তার রোগের বিছানা ছেড়ে স্টেপুকাস যেদিন প্রথম জানালায় দাঁড়ালো সে দেখতে পেলো শুধু ছোট স্রোতটার ওপর নয়, এমন কি বড় নদীটার ওপরও বরফ জমেছে। ঘুরে মনোযোগ সহকারে প্রথমে তার বাবা আর পরে তার মা'র দিকে চেয়ে রইলো। কিন্তু যেহেতু সেটা গোপনীয় কথা, সেহেতু সেটাকে গোপনেই রাখতে হবে—তাই স্টেপুকাস কোনো প্রশ্ন করলো না। এখন আর তার বাবা খামারে খাবার নিয়ে যান না।

প্রতিনিধি

প্রিৎসেলিস'এর উত্তেজিত হবার কারণ ছিল। অনেক বছর আন্দ্রিয়ুস'কে সে দেখেনি, অনেক অনেক বছর। লোকেরা এখনো আন্দ্রিয়ুস কার্তাসিয়ুস'এর কথা বলে, সেই কামারের কথা। লোকে বলে সেই বুড়ো এতো একগুঁয়ে

ছিল যে গরমে সাদা হয়ে যাওয়া লোহার টুকরোকে সে খালি হাতে ধরতে পারতো। তার ছেলের নামও আন্দ্রিয়ুস। সম্ভবত সবাই তাকে ভুলে গেছে শুধু তার বাল্য-বন্ধু প্রিৎসেলিস ছাড়া। এই সেদিন প্রিৎসেলিস তার বন্ধুদের দেখিয়েছে যখন তারা বাচ্চা ছিল তখন ঘণ্টাঘরের দেয়ালে সে আর আন্দ্রিয়ুস নিজেদের বাড় মাপবার জন্যে যে দাগগুলো কেটেছিল সেগুলোকে।

প্রিৎসেলিস তার বন্ধুদের দেখাতে পারতো দ্বীপগুলোর কোন কোন জায়গায় সে আর আন্দ্রিয়ুস আগুন জ্বালাতো, যখন তারা সেখানে যেতো তাদের সরু আর লম্বা নৌকো করে। কার্তাসিয়ুসের কুটীর একদা যেখানে ছিল সেখানকার বুড়ো আপেল গাছটার একটি মাত্র ডালে এখনো ফল ধরে। ছড়ি আর ডাল দিয়ে পথিকরা আপেল পাড়ে, কিন্তু প্রায় ছাল ছাড়ানো আপেল গাছটা ক্রমাগত ফুল ফুটিয়ে চলে। গাছটা শক্ত আর গাঁটে ভরা, কামারের হাতের মতো।

আন্দ্রিয়ুসকে নিশ্চয়ই সেই আপেল গাছটা সে দেখাবে। কিন্তু আন্দ্রিয়ুস এটা চিন্‌তে পারবে? ওরকম গণ্যমান্য লোকের কি প্রিৎসেলিসের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথাটা মনে থাকে? কিন্তু হয়তো মন খুলে কথা বলার সময় তারা পাবে না

এবং প্রিৎসেলিসের স্মৃতিকথা এই বিখ্যাত লোকটির কাছে অত কিছু দামী বলে মনে না হতেও পারে। মনে রাখা দরকার তিনি এখন একজন জেনার‍্যাল। লোকেরা যদি জানতে পারে যে তিনি সেই সব তুচ্ছ কথা শুনছেন—যেগুলো তাদের ছেলেবেলায় অমন দামী বলে মনে হতো—তাহলে হয়তো তিনি অপ্রস্তুত বোধ করবেন।

আন্দ্রিয়ুস কার্তাসিয়ুস, ত্রিশ বছর আগে যে ছোকরা মাঠে আর বনে প্রিৎসেলিসের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো, সে যে এখন জেনার‍্যাল হয়েছে এটা কষ্ট করে ভাবতে হয়।

গত বছর গানের উৎসবে তাকে যেতে বাধ্য করায় এখনো সে তার স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পারেনি। এমনি কপাল, আন্দ্রিয়ুস ঠিক সেই দিনই গ্রামে এসেছিলেন। তার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে প্রিৎসেলিস সেই আসার বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছিল। কেউই কিন্তু উল্লেখ করেনি যে জেনার‍্যাল তার কথা জিগ্‌গেস করেছিলেন। সব কিছুই তিনি দেখেছিলেন এবং এটা সেটা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তারপর উলিনস্কিস'দের বাড়ী গিয়ে কিছু দুধ পান করেছিলেন। আর খাবার পরে প্রশ্ন করেছিলেন হ্রদের মধ্যে আগেকার মতো অতগুলো হাঁস আছে কি না। তিনি

বলেছিলেন তখন তাঁর তাড়া আছে, কিন্তু কোনো না কোনো এক সময় নিশ্চয়ই তিনি আবার আসবেন এবং তাঁর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবেন।

উলিনস্কিস'দের কুটীর লোকে ভরে গিয়েছিল— প্রত্যেকে জেনারাল্যকে দেখতে চায়। লোকে বলেছিল যে তাঁর বুকে ছোট আর বড় এতো ধরণের পদক আর সম্মানের চিহ্ন আছে যে সেখানে আর জায়গা নেই।

জেনারাল্য মেয়েদের গান গাইতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু বোকাগুলো লজ্জা পেয়ে একজন আর একজনকে খোঁচা দিয়েছিল, অনেকক্ষণ ধরে গান গাইবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত যখন তারা সুরু করেছিল প্রত্যেকেই চেয়েছিল গাইতে এবং একটার পর একটা গান তারা গেয়েছিল। ধন্যবাদ জানিয়ে আন্দ্রিয়ুস তাদের প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু তবু তিনি বলেছিলেন যে তাঁদের সময় ও-ভাবে তাঁরা গান গাইতেন না।

কী দুঃখের কথা, প্রিৎসেলিস সেখানে ছিল না। পুরোনো গানগুলো সে মনে করতে পারতো।

কত বছর কেটে গেছে! ১৯১৯ সালে লাল ফৌজ যখন এ-অঞ্চলে এসেছিল আন্দ্রিয়ুস এবং সে ছিল কমবয়েসী। আন্দ্রিয়ুস এবং সেই বুড়ো কামার সঙ্গে সঙ্গে

লাল ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন এবং দুজনেই হয়েছিলেন অদৃশ্য… এদিকে, সে ‘দরিদ্র কৃষক কমিটি’তে কেরানীর কাজ করার জন্য প্রিৎসেলিসকে শ্বেত বাহিনীর সৈনিকরা ধরেছিল। নিজেদের তারা বল্‌তো লিথুয়ানিয়ার সৈন্য। সেই ‘লিথুয়ানিয়ার সৈন্য’ গির্জের উঠনে দু’লাইনে দাঁড়াতো আর কমিটির সবাইকে প্রায় উলঙ্গ করে এনে দু’পাশ থেকে আক্রমণ করতো। উলান’দের রাইফেলের বাঁট কৃষকদের মাথায় আর পিঠে এতো জোরে পড়তো যে তাদের হাড়গুলো ভেঙে যাওয়ার শব্দ যেন যেত শোনা। আর ‘লিথুয়ানিয়ার’ মেজর পাদ্রীর সঙ্গে বারান্দায় বসে ব্র্যাণ্ডি মেশানো চা খেতেন আর ইয়ার্কি করতেন।

‘সমতা আর ভ্রাতৃত্বের হিসেব চাবুক মেরে মিলিয়ে দাও। বলশেভিকদের টের পাইয়ে দাও!’

দানবদের কাছে সে দৃশ্য ছিল ভারি মজাদার; ‘দরিদ্র কৃষক কমিটি’কে উলান’রা শিক্ষা দিচ্ছেন দেখে তারা খুব আনন্দ পেতো।

উকমের্গ্ সহরে মাটির তলার এক জেলখানায় ছ’মাস ধরে প্রিৎসেলিসকে রাখা হয়েছিল। তার বয়েস কম ছিল

বলে সে বেঁচে গেল। নাবালক বলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

কিন্তু তারপর থেকে সে এলাকায় যা-ই ঘটুক না কেন— কৃষকরা জমিদারদের কাছ্ থেকে খাদ্য দাবি করুক কিম্বা বনের সবচেয়ে উঁচু গাছের ওপর খুব সকালে লাল পতাকা দেখা যাক— প্রিৎসেলিস'এর ঘাড়েই দোষ পড়তো। তাকে বন্দী করে পুলিশরা মাউজার পিস্তলের বাঁট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে বলতো এসব তারই কীর্তি এবং সে একজন বলশেভিক।

১৯৪০ সালে লাল ফৌজ ফিরে এলো আর সে বছ্রই প্রিৎসেলিসকে লোকেরা ভলোস্ট কমিটিতে নির্বাচন করলো। কিন্তু শয়তান তখন কাজ করে চলেছে— লড়াই সুরু হলো। পালাবার সুযোগ প্রিৎসেলিস পেলো না। এস্ এস্'দের পোষাক পরে জমিদারের ছেলে ফিরলো এবং কমিটির লোকদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করে সবাইকে জেরবার করে ফেললো। এক সৎ ব্যক্তি প্রিৎসেলিসকে লুকোবার জায়গা দিল, লুকিয়ে রাখলো তাকে রুটি সেঁকার উনুনের মধ্যে। একমাস ধরে অবশ হয়ে সে সেখানে ছিল, বোতলের ছিপির মত সে এপাশ ওপাশ বা সোজা হতে পারেনি। তারপর এক শীতের রাত্রে বাড়ীর কর্তা সাদা বিছানার চাদর সেলাই

করে তাকে একটা আলখাল্লার মতো পোষাক বানিয়ে দিলো আর সে বরফ পেরিয়ে প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে নেমান'এর অন্য তীরে গেল চলে।

কী সব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই না তাকে যেতে হয়েছে সে-সব বছরে! মাত্র গতকালই নির্বাচন কেন্দ্রে প্রিৎসেলিস জেনেছে যে জেনার‍্যাল আর একবার আসবেন। গ্রামের সমস্ত লোক তখন জড়ো হচ্ছে নানা সভার জন্যে এই নির্বাচন কেন্দ্রে। সেখানে তাদের জন্যে রয়েছে একটা বেতার-যন্ত্র আর খবরের কাগজগুলো সর্বদাই তাজা। কাজের পর প্রিৎসেলিস নির্বাচন কেন্দ্রে গিয়ে দেখলো আর একটা সভার কাজ চলেছে: বৃদ্ধ, তরুণ এবং ইস্কুলের শিক্ষকরা রয়েছে সেখানে। পার্টির সংগঠনকারী প্রিৎসেলিসকে দেখবামাত্রই হাত নাড়ালেন:

'এখানে এস। লোকেদের পিছনে লুকিয়ে থেকো না!'

প্রিৎসেলিস তাঁর কাছে আসার পর তাকে তিনি ছোট একটা বক্তৃতা দেবার জন্যে সম্মত করাতে চেষ্টা করলেন। ইতিপূর্বে কোনো সভায় প্রিৎসেলিস বক্তৃতা করেনি, কিন্তু প্রিৎসেলিস'এর সমস্ত অনুনয় এবং আপত্তি উপেক্ষা করে পার্টির সংগঠনকারী টেবিলে পেন্সিলের শব্দ করে ঘোষণা করলেন:

'বন্ধুগণ আমাদের একজন বিশিষ্ট ট্র্যাক্টর-চালক, প্রিৎসেলিস, লিথুয়ানিয়ার সর্বোচ্চ পরিষদের নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু বলবেন।'

প্রিৎসেলিস'এর মনে হয়েছিল যে সে একটা কথাও বলতে পারবে না। কিন্তু নিজের প্রথম কয়েকটা কথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই সব ভয় তার কেটে গেল।

'আমি কয়েকটি কথা বলবো কারণ আমাকে বলতে হবেই', সে সুরু করলো। 'আমি যতোক্ষণ ধরে এখানে আছি আপনাদের মধ্যে কয়েকজন বলবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন। বাজিকাস'এর কথাটাই ধরা যাক। মাত্র তিনটি কথা বলতে না বলতেই তিনি বসে পড়েছেন। আর এক-জন বলতে সুরু করেছিলেন কিন্তু সবাই আপনারা উঠেছিলেন হেসে। ইতিপূর্বে আমাদের কেউ যে বক্তৃতা দিতে শেখায়নি সেটা কি আমাদের দোষ? ইতিপূর্বে কেউ কি আমাদের মতো সরল লোকদের উৎসাহ দিতে এসেছিল, আমাদের সমস্যার কথা জানতে, জানতে কি কারণে আমাদের জীবন-যাত্রা কঠিন হয়ে উঠেছে? লোকেদের মধ্যে কেবল পুলিশই এসেছিল। আমি কিন্তু এ-বিষয়ে একেবারে আন্তরিক কথা বলবো, কচি শিশুর মত সোভিয়েত শক্তি আমাদের লালন-পালন করছে, কিন্তু

কোনো সন্দেহ নেই যে সময় যখন আসবে তখন আমরা আমাদের মাটির ওপর এমন দৃঢ় পায়ে হাঁটবো ভদ্র-সম্প্রদায় যে-ভাবে কখনো হাঁটেনি। আপনারা দেখে নেবেন।'

উৎসাহিত হাততালি শোনা গেল। আবেগে প্রিৎসেলিস'এর শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠলো। সিগারেটের ছোট টুকরোটা ছাইদানিতে পিষে অনেকক্ষণ সে চুপ করে রইলো।

'এবার আমি নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু বলবো। আগেকার দিনে ভদ্র-সম্প্রদায়ের হাতে যখন শক্তি ছিল, এমন কেউই ছিল না যাকে আমরা ভোট দিতে চাইতাম। আমার মনে পড়ে তাদের দলের নির্বাচন প্রার্থীদের গোটা বারো নামের তালিকা আমরা পেয়ে থাকতাম আর প্রত্যেকটি নাম থেকেই মনে হতো যেন এক এক থলি টাকার শব্দ পাচ্ছি। নির্বাচন-প্রার্থীদের মধ্যে একজন ছিলেন, শোনা যায়, যিনি চাষী। সুদারগিস তাঁর নাম। মনে হলো যেন চেনা। তারপর আমার মনে হলো এই চাষীটি কাউণ্ট কর্জ্জনের কাছ থেকে একটা জমিদারি কিনেছেন। ভালো কথা, এখন আমি ভাবতে সুরু করেছি: সর্বোচ্চ পরিষদে কাকে আমরা নির্বাচন করবো? আমি যা বুঝি তা হচ্ছে এই, সে-রকম লোকেরই আমাদের দরকার যে হবে ভালো চাষী আর কঠোর পরিশ্রম করে যে ক্ষেতের ফসল দিয়ে আমাদের

খাওয়াতে পারবে. কিম্বা একজন ভালো যন্ত্রবিদ যে আমাদের যন্ত্রগুলোকে পারবে চালু রাখতে, কিম্বা একজন শিক্ষক যে লেখা পড়া শেখাবে আমাদের ছেলেমেয়েদের, কিম্বা একজন ডাক্তার, আমাদের জন্যে সাধ্য মত খাটবে এবং দেখবে যাতে বুড়োরা বেশীদিন বাঁচে আর ছোটরা না মারা যায়! ঠিক বলেছি কি? আর ভদ্র-সম্প্রদায় প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে—তারা যে কেমন লোক তা ইতিমধ্যেই আমি বলেছি। এখন আগেকার কথায় আবার আসা যাক…'

তার বক্তৃতার পর অনুমোদনসূচক তীব্র করতালি শোনা গেল। পার্টির সংগঠনকারী এবং মঞ্চের উপরকার আর সবাই তাকে অভিনন্দন জানালেন আর বললেন যে সেই সন্ধ্যায় তার বক্তৃতাটাই সবচেয়ে ভালো হয়েছে। সভার পর তাকে থাকতে অনুরোধ করা হলো আর ভলোস্ট কার্য-নির্বাহ সমিতির সভাপতি পরের দিন তাকে ভলোস্ট আপিসে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন, যখন সর্বোচ্চ পরিষদের পদপ্রার্থীকে নির্বাচন করা হবে।

প্রিৎসেলিস প্রশ্ন করলেন, 'কাকে আমরা ঠিক করছি?'

'কাকে তোমার মনে হয়? আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোক কে? যন্ত্রপাতি আর ট্র্যাক্টর কেন্দ্রের লোকদের

এবং গালাবুদ্ ভোলোস্টের চাষীদের সঙ্গে আলোচনা করে সবচেয়ে ভালো লোককে আমরা মনোনীত করবো।'

'তাহলে ঠিক লোক হচ্ছেন জেনার‍্যাল কার্তাসিয়ুস। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে তিনি সব কিছুই এমন চমৎকার করে রাখবেন যে আমাদের ভোলোস্ট'এর কাছে অন্যরা অনেক কিছু শিখতে পারবে—অন্তত বীজ-বোনা এবং ভবিষ্যতের কর্মধারা সম্বন্ধে।'

প্রিৎসেলিস যখন উত্তেজিতভাবে তর্ক করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিল যে সমস্ত এলাকার মধ্যে জেনার‍্যাল চেয়ে ভালো লোক আর কেউ নেই চতুর্দিকে তখন লোকেরা হাসছিল। সর্বোচ্চ পরিষদে জেনার‍্যাল যদি নির্বাচিত হন তাহলে প্রিৎসেলিস তাঁর মুখের ওপরই বলবে: 'যদিও তুমি এখন জেনার‍্যাল, আমার কাছে এখনো তুমি আন্দ্রিয়ুস। আর শোনো আন্দ্রিয়ুস, আমাদের দেশেই তোমার জন্ম, এখানেই হয়েছো লালিত-পালিত আর তোমাকে আমরাই ভোট দিয়েছি। অতএব এলাকা কেন্দ্র এবং রাজধানীর লোকদের বোলো আমাদের জন্যে ভালো একজন ডাক্তার পাঠাতে, আমাদের নতুন একটা ইস্কুল বানিয়ে দিতে আর কল থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে আমাদের গ্রামে··· হ্যাঁ, আর তাদের

বোলো…' তাঁকে দিয়ে আরো অনেক কাজ আমরা করিয়ে নিতে পারবো। তাঁর মতো লোকের পক্ষে এ তো নেহাৎই ছেলে খেলা। তিনি এখন জেনারাল। কোনিগ্‌স্‌বার্গ তিনি জয় করেছেন।

যাবার সময় প্রিৎসেলিস শুনলো সভাপতিকে পার্টির সংগঠনকারী বলছেন:

'উয়েজ্‌দ্ পার্টি কমিটি থেকে টেলিফোন করে বলেছে: কালকে রাত্রির আহারের সময় তিনি এখানে আসবেন।'

'এটা কি একেবারে ঠিক?'

'হ্যাঁ, আমি নিজে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা যেন তাঁকে জেনারালের উপযুক্ত অভ্যর্থনা জানাই— তারা ভারি উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে।'

'এটা তাহলে বাস্তবিক এক উৎসবের ব্যাপার হবে। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি প্রত্যেকেই দৌড়ে আসবে তাঁকে একবার দেখার জন্যে। কিন্তু রাত্রে তাঁর থাকার ব্যবস্থা কোথায় আমরা করবো?'

'আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছো, তার পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে,' প্রিৎসেলিস মনে মনে ভাবলো। 'যাক এটা তোমাদেরই মাথাব্যথা, আমি কিন্তু জেনেছি আন্দ্রিয়ুস কখন আসছে। কাল যদি কাউকে তোমরা নির্বাচন করতে

যাচ্ছে। আমি তো ভেবে পাচ্ছি না সেছাড়া অন্য কেউ হতে পারে।'

বাড়ীতে ফিরেই প্রিৎসেলিস চেঁচিয়ে উঠলো:

'ওনা, ঘরদোর পরিষ্কার করে ফেলো! জেনারাল কার্তোসিয়ুস কাল এসে পৌঁচচ্ছেন। আমার ডোরাকাটা পেণ্টুলুনটাকে ইস্ত্রি করো আর দেখো সবকিছুই যেন লাঙলের ফলার মতো ঝক্-ঝক্ করে। জানো তো, তাকে আমরা আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছি! এতে আমার খানিকটা হাত আছে। লোকেদের মাথায় কথাটা আমি ঢুকিয়েছি। একজন লোকের মত লোক! তুমি দেখো…'

পরের দিন খুব সকালে, যখন অন্ধকার ছিল, প্রিৎসেলিস হ্রদের দিকে চললো একটা পাখী-মারা বন্দুক বগলে চেপে। প্রতিবার তীর ধরে হাঁটার সময় তুষার-মুক্ত জলের প্রতিটি জায়গায় সে দেখছিল হাঁসের দল ভিড় করে রয়েছে। এই দৃশ্যে সর্বদাই তার বুক উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে।

এবার সে চল্‌লো দ্বীপের দিকে। একটা ঝোপের পিছনে ভালোমতো জায়গা পেয়ে, তুষারের মধ্যে নিজের জন্যে সে একটা আস্তানা বানালো। শীঘ্রই ভোর হবে। তুষারের মাঝখানে খোলা মাঠের মধ্যে বসে থাকতে ভালো লাগলো। বাতাসে অল্‌ডার গাছের ছালের আর একটা

ভিজে অস্পষ্ট গন্ধ ভেসে আসছে—শীঘ্রই বরফ গলার সঙ্কেত।

একজোড়া হাঁস দিয়ে তার বন্ধুকে পুলকিত করতে প্রিৎসেলিস চেয়েছিল। গতবার যখন এসেছিলেন তখন কার্তাসিয়ুস হাঁস সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নিজেই তার মাথায় এ মতলব ঢুকিয়েছেন।

দ্বীপের একটা ঝোপের মধ্যে একটা পাখী ভীরুভাবে ডেকে উঠলো। কী পাখী প্রিৎসেলিস্ জানে না, কিন্তু তার ডাক বালালাইকার তারের মতো অল্প সময়ের মধ্যে বারবার কেঁপে ওঠায় সে বুঝলো যে শীত শেষ হয়ে আসছে।

'বসন্তকালে লাঙল যখন প্রথম মাটি কাটবে সময়টা তখন চমৎকার হবে।'

ক্রমশ আলো হয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু একটা হাঁসও দেখা গেল না। তাকে জব্দ করবার জন্যেই যেন অদৃশ্য হয়েছে। শিকারী অপেক্ষা করলো এক ঘণ্টা, তারপর আরো এক ঘণ্টা। ঠাণ্ডায় সে কাঁপতে লাগলো, কিন্তু তবুও কোনো হাঁস উড়ে গেল না। বিরক্ত হয়ে একটা হাত সে বরফ গলা জলে ভরা এক ডোবার দিকে নাড়িয়ে দ্বীপের মধ্যে দিয়ে চললো একটা খরগোস মারবার আশায়। কিন্তু একটাও চোখে পড়লো না। ঠিক যখন সে সব আশা-

ভরসা ত্যাগ করতে বসেছিল. সরু একটা টিলার ধার দিয়ে সে এসে পড়লো ছোট একটা বরফের গর্তে, আর চমকিয়ে দিলো একদল তিতির পাখীকে। ততক্ষণাৎ সে চারটে পাখী মারলো।

প্রিৎসেলিস যখন বাড়ীর দিকে ফিরলো তখন দুপুর অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। দূর থেকে চোখ কুঁচকে সে দেখতে চেষ্টা করলো কোনো মোটরগাড়ী কিম্বা অন্য কোনো চিহ্ন যাতে বোঝা যায় কার্তাসিয়ুস পেঁৗচেছেন। কিছুই দেখতে না পেয়ে পথ সংক্ষেপ করার জন্যে পিছনের উঠন এবং সব্জি-বাগানের ভেতর দিয়ে সে গেল।

বেড়াটা লাফিয়ে পার হয়ে তার বারান্দায় পেঁৗছবার সময়ই প্রথম সে শুনতে পেলো বসার ঘরের ভিতরে নানা লোকের কথা এবং হাসির শব্দ।

'ও এসেছে।' ভাবলো সে, দ্রুততর হলো তার বক্ষ-স্পন্দন।

প্রিৎসেলিস ঠিক করলো প্রথমে তার বাড়ীর অন্যদিকটায় তার প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে নিজের চেহারাটাকে ভদ্রস্থ করে তুলবে। জামা-কাপড় পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে তার স্ত্রীকে ডেকে রবিবারের পোষাকটা চেয়ে নিতে সে পারবে। কিন্তু চৌকাঠে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটা

হাট হয়ে খুলে গেল আর প্রিৎসেলিস এই মাত্র ঠিক যে কথাগুলো মনে মনে বলেছিল কে একজন গলা সপ্তমে তুলে ঠিক সেই কথাগুলোই আবৃত্তি করলো:

'ও এসেছে।'

'চলে এসো তোমরা, এবার সবাই একসঙ্গে, এক, দুই, তিন!'

চারিদিক থেকে সবাই প্রিৎসেলিসকে জাপ্‌টে ধরে শূন্যে তুলে ধরলো। কে একজন নিয়ে নিলো তার বন্দুকটা। যে পাখীগুলো সে মেরেছিল সেগুলো তার কাঁধ থেকে পিছলে পড়লো। উত্তেজনার কারণটা সে বুঝতে পারলো না। অবশেষে তাকে মাটিতে নাবানো হলো এবং রাশি রাশি অভিনন্দন ঝরতে লাগলো তার ওপর। কেবল তখনই সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো যে যন্ত্রপাতি এবং ট্র্যাক্টর কেন্দ্রের লোকেরা এবং গালাবুদ ও শিক্স্‌নিয়াই ভোলস্টের চাষীরা তাদের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে মনোনীত করেছে।

'কিন্তু জেনার‍্যাল কার্তাসিয়ুসের কি হোলো? সবাই কি তোমরা পাগল হলে? নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হয়েছে।'

'কোনোই ভুল হয়নি...'

'দাঁড়াও, এক মিনিট দাঁড়াও।' নিজের কথা সবাইকে শোনাবার জন্যে প্রিৎসেলিস অনুরোধ করলো, 'সভাপতি,

দাঁড়াও··· গতকাল তোমাকে বলতে শুনেছি যে আজ সে আসবে এবং তাকে যেন জেনার‍্যালের উপযুক্ত অভিনন্দন জানানো হয়···'

'ও, তুমি সেই গায়কের কথা বলছো? উয়েজ্‌দ্ কমিটির লোকেরা ব্যস্ত হয়েছিল যেন তাকে আমরা উপযুক্ত সম্মান দেখাই। ইস্কুল বাড়ীতে আজ সন্ধ্যে গানের একটা জল্‌সা আছে। গায়ক গুতাউছুস আসছেন।'

প্রিৎসেলিসের সব গোলমাল হয়ে গেল। লজ্জিত ভাবে সে হাসলো, আরক্ত হয়ে উঠলো, হতাশভাবে হাতদুটো তুললো ওপরে এবং লজ্জিতভাবে ক্ষমা চাইলো।

'বন্ধুগণ, বাস্তবিকই এটা কি আপনারা চান? এতোবড় সম্মান আমার পাবার কথা নয়। আমি—সাদাসিধে একটা লোক···'

'ও গল্পটা আর সুরু করবে না! গতকাল তুমি তো বলেছিলো যে আমাদের কর্তব্য সেই সব ডাক্তারদের মনোনীত করা যাঁরা আমাদের ছেলেমেয়েদের এবং বয়স্কদের উপযুক্ত যত্ন নিয়ে থাকেন, কর্তব্য সেই সব শিক্ষকদের মনোনীত করা যাঁরা ভালো পড়াতে পারেন, সেই সব কৃষকদের মনোনীত করা যাঁরা ভালো কাজ জানেন এবং আমাদের ফসল দেন—ভালো কথা, আমাদের উয়েজ্‌দ্'এর

ভেতর তুমি সবচেয়ে ভালো ট্র্যাক্টর চালিয়ে’, তার বন্ধুরা বল্‌লো।

ভলোস্ট কার্য-নির্বাহ সমিতির সভাপতি বললেন, ‘আর একটা কথা, তোমার জন্যে কতকগুলি নির্দেশ আমরা রচনা করেছি।’

বিস্মিত হয়ে প্রিৎসেলিস প্রশ্ন করলো, ‘কী সব নির্দেশাবলী?’

‘যদি তুমি নির্বাচিত হও তাহলে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে এখানে আমাদের একজন ডাক্তারের দরকার, আর একটা নতুন ইস্কুলেরও··· আর কল থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিদ্যুৎ তার বসাতে হবে··· আর পরের বছর···’

প্রিৎসেলিস তর্ক করতে চেষ্টা করে বললো, ‘এসব পারবো কি না জানি না। আপনাদের দরকার জেনার‍্যাল।’

‘অন্য এক জায়গায় জেনার‍্যাল নেতৃত্ব করছেন। এদিকে আমাদের ভলোস্টে সব কিছু ঠিক মতো চালাবার কাজ দেওয়া হচ্ছে তোমাকে।’

প্রিৎসেলিসকে আর কোনো কথা বলবার সুযোগ দেওয়া হলো না। সবাই তাকে অভিনন্দন জানালো আর তার বন্ধুরা করলো করমর্দন।

বন্ধুদের মাথার ওপর দিয়ে দরজায় প্রিৎসেলিস তার স্ত্রীর উদ্ভাসিত মুখ দেখতে পেলো আর সেই পলাতক মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে তার সমস্ত জীবন ভেসে উঠলো: গির্জের উঠনে উলানরা তাকে মারছে বন্দুকের বাঁট দিয়ে, পুলিশ তাকে নিয়ে চলেছে এক জেল থেকে অন্য জেলখানায়, যে সব লোকেদের জন্যে সে ফসল ফলাতো আর লাঙল চষতো তাদের কেউই তার সপক্ষে একটি কথাও বলেনি…

সর্বান্তঃকরণে তার বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাতে অদম্য ইচ্ছে হলো তার।

'স্তালিন…' সুরু করলো প্রিৎসেলিস, কিন্তু কান্না তার কণ্ঠ রোধ করলো।

আরো কিছু সে বলতে চাইলো, কিন্তু তারপর সে হৃদয়াঙ্গমে করলো যে ঐ একটি কথার মধ্যে দিয়েই তার হৃদয়ের সমস্ত পুঞ্জীভূত কথাকে সে উজাড় করে দিয়েছে।

গান

সবাইকার সঙ্গেই ইয়োকুবাস ঝগড়া করেছে। গত দু'দিন থেকে সে আর কথাই বলেনি, হয় এক কোণে একা বসে থেকেছে কিম্বা বজ্র ভরা থমথমে মুখ করে সমস্ত বাড়ীময় ঘুরে বেড়িয়েছে। সংসারের কর্তা হিসেবে তার

কথার মূল্য আজ আর নেই, কেউ তাকে একটুও আমল দেয় না। সত্যি বটে যে তার ছেলেরা তাকে মারেনি কিন্তু যা-কিছু বলেছে সব কিছুতেই তারা চোখ মট্‌কেছে। তবুও কিন্তু লোকেরা এখনো বলে থাকে আপেল গাছের কাছেই আপেল পড়ে। জীবন সম্বন্ধে কথাটা যে কতটা খাটে দেখা যাক: পড়ার পর আপেলটা এতো দূরে গড়িয়ে গেছে যে বোঝাই যায় না কোন গাছ্ থেকে সেটা পড়েছে।

নতুনভাবে মাটী চষার কথাটা সমস্ত বসন্তকাল ধরে ইয়োকুবাস শুনে এসেছে। ভোলোস্ট কমিটির লোকেরা ক্রমাগত এসেছে গ্রামে, সভা ডেকেছে আর পার্টি কমিটির চিঠি পড়েছে, কিন্তু একজনও কি বুদ্ধিমান চাষী সই করেছে সেই চুক্তিতে? শুনেছে তারা ঠিকই, কিন্তু কাগজে সই করার কথা হলেই কুটীর জনশূন্য হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষদের প্রতিটি আহ্বানে লোকদের ছুটে আসতে কে কবে শুনেছে। কর্তৃপক্ষদের মনে কখনো কি দেশবাসীদের প্রতি সদিচ্ছা থাকে? কথাটাকে ভালো করে ভেবে দেখার সময় এখনো আছে, সময় আছে এই নতুনভাবে চাষবাস করার ফলে ভালো কিছু হবে কি না সে কথাটা বিজ্ঞ ব্যাক্তিদের কাছ্ থেকে শোনার। দু'বছর ধরে জমিটা অনাবাদি হয়ে পড়ে

আছে। আরো দু-এক গ্রীষ্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করলে কোনো ক্ষতি হবে না। পৃথিবীতে কত পতিত জমি আর কত ক্ষেত আর কত ঘাস-না-কাটা মাঠ যে রয়েছে সে বিষয়ে সে মাথা ঘামাতে চায় না। ভদ্রলোকেরা সেগুলোকে বন্য অবস্থায় রেখেছে, তাদের শিকারী কুকুর নিয়ে সেখানে গিয়েছে শিকার করতে; এই সব জমি কখনো লাঙল কিম্বা মই'এর আস্বাদ পায়নি। ভদ্রলোকেরা ভদ্রলোকের মত জীবন কাটিয়েছে আর চাষীরা কাটিয়েছে চাষীদের মতো, আর প্রত্যেকেই জেনে এসেছে প্রত্যেকের স্থান্ কোথায়। এখন কিন্তু প্রতিদিনই কিছু না কিছু নতুন কাণ্ড ঘটে, প্রত্যেকটা কথাই এখন আদেশ। আর যদি তুমি কখনো প্রশ্ন করো কার হাতে এখন ক্ষমতা এবং কোথায়ই বা রয়েছে সেই ক্ষমতাটা, তোমার নিজের ছেলেমেয়েরাই তাহলে উত্তর দেয়: 'আমরাই ক্ষমতা। শ্রমিকদের হাতেই ক্ষমতা।' মাত্র এক বছর আগেও ইয়োকুবাস এ ধরণের কথার দাম কানাকড়িও দিত না, কিন্তু এখন কথাটার পিছনে যে সত্য আছে সেটা না উপলব্ধি করে সে আর পারে না।

তার নিজের ছেলে, ভূতপূর্ব এক ক্ষেত-মজুরের সন্তান, লেভনপোলিসের সম্পত্তিটা নিজে হাতে দিয়েছে ভাগ করে

আর এদিকে স্টুলগিআই'এর বাষ্প-চালিত মিল এবং সেখানকার সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনা করছে এক দরিদ্র অবিবাহিত কৃষকের ছেলে ক্লিচুকাস। লেভনপোলিস সম্পত্তির জমিদার মুরাশ্কা ইয়োকুবাসের কুটীরে এসে, মাথা থেকে টুপি খুলে সজল নয়নে অনুনয় করেছে অন্তত ছোট একটুকরো জমি যেন তাকে রাখতে দেওয়া হয়। চেষ্টা করে ভেবে দেখ একবার কথাটার মানে কী: কুড়ি বছর ধরে ইয়োকুবাস ভদ্রলোকদের জন্যে খেটেছে, কিন্তু সেবারই প্রথম সে দেখলো টুপিহীন এবং সজল চোখে একজন জমিদারকে এক চাষীর ছেলের সামনে দাঁড়াতে।

নিজের চোখকেই ইয়োকুবাস বিশ্বাস করেনি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাটা সে ভেবেছে—কি হবে? সর্বত্রই লোকেরা ফিস্ ফিস্ করছে, বড়লোকরা উপহাস করছে সোভিয়েত শক্তিকে, কিন্তু লুকিয়ে তারা ফসল ফেলছে পুঁতে আর জন্তু-জানোয়ারদের রাখছে বনে লুকিয়ে। নদীর ওপাশে উপত্যকায় মাত্র তিনটি খামার আছে: এ জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে ভালো। লড়াইয়ের সময় তাদের মালিকরা পালিয়েছে এবং গত দু'বছর ধরে জমি পড়ে আছে অনাবাদী হয়ে। ভালো জমিকে এভাবে রাখা উচিত

নয়। দরিদ্র কৃষক আর ক্ষেত-মজুররা ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলো। তারা সভা ডাকলো, কাগজে সই করলো এবং স্থির করলো সবাই মিলে জমিটাতে চাষ করবে 'সমবেত ভাবে'। এই কাজের জন্যে প্রথমে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল ইয়োকুবাসের দুই ছেলে এবং গালিয়াউসকাই গ্রামের চারজন নতুন বাসিন্দা।

অনেকদিন ধরে ইয়োকুবাসের ছেলেরা উপত্যকায় যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় মই আর ডল্‌না। আর এখন তারা লাউছ্‌কাসের ঘোটকীটাকে নিয়ে গেছে তাদের নিজেদের খামার থেকে সার বইবার জন্যে অন্য মাঠে, যেটা তাদের নয়। ভাবো একবার 'সমবেত ভাবে' কাজ করা!

সহরে 'সমবায়-সমিতি' আছে বলে ইয়োকুবাস জানে, যেখানে বিক্রী হয় কেরোসিন, পেরেক, ঘোড়ার খুরের নাল এবং নুন, কিন্তু কে কবে শুনেছে—জমিকে 'সমবায়-সমিতি' নাম দিতে। ছেলেদের ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করে না। কয়েক বছর ধরে সংসারের লাগাম তারা নিজেরা নিয়েছে এবং তাদের বাবার আদেশ শোনা বন্ধ করেছে।

সমস্ত সকাল ইয়োকুবাস বাড়ীময় ঘুরে এক রাশ কাঠের টুক্‌রো জমিয়েছে আর চালা-ঘরে নিয়ে গিয়েছে

শুক্‌নো জ্বালানি কাঠ। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো রোদে শরীরটাকে সেঁকবার জন্যে চালা-ঘরের কাছে একটা শ্লেজে গিয়ে বসলো। ক্ষেতটা এখনো সবুজ হয়ে ওঠেনি, কিন্তু ইতিমধ্যেই সেটা শুকিয়ে চিড় খেতে সুরু করেছে। দূর থেকে সেটাকে দেখায় সাদা। ইতিমধ্যেই কয়েকটি মাঠের কর্মরত লাঙলগুলো চোখ ধাঁধানো আলো ঠিকরোচ্ছে। ওসিয়ার গাছের ছাল থেকে ছেলেরা যে বাঁশিগুলো বানিয়েছিল সেগুলো খাদ থেকে বাজতে শোনা যাচ্ছে। পদশব্দ শুনে ইয়োকুবাস ফিরে তাকিয়ে দেখলো টুপি পরা দীর্ঘকায় এক অপরিচিত ব্যক্তিকে তাদের উঠনে ঘুরে বেড়াতে। ওখানে সে করছে কী? ইয়োকুবাস ভাবলো হয়তো সে কমিটি থেকে এসেছে তার কোনো ছেলের খোঁজে।

'রোদ পোয়াচ্ছেন?'

লোকটাকে ইয়োকুবাস চিনতে পারলো। নাম তার বেনেডিক্‌টাস ব্রেডিকিস। ইতিপূর্বে ক্বচিৎ কখনো এ অঞ্চলে তাকে দেখা যেতো। কিন্তু এখন সে ইচ্ছে করেই ঘন ঘন আসতে সুরু করেছে। তাকে দেখার পর মুহূর্ত থেকেই ইয়োকুবাস ভাবলো লোকটাকে কেমন যেন অন্য রকম দেখাচ্ছে: যদিও সে সহুরে টুপি পরেছিল, তার পোষাকটা ছিল ময়লা আর কোঁচকানো।

'মাত্র তিন বছর আগে তোমার কত প্রতিপত্তি ছিল—এ অঞ্চলের মধ্যে তুমিই ছিলে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি,' বৃদ্ধ ভাবলো, 'কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অবস্থাটা বেশ পড়ে গেছে। এতে অবশ্য বিস্ময়ের কারণ নেই—সেবার সোভিয়েত শক্তি তোমার জমির অর্ধেকটা নিয়ে নিয়েছে আর তারপর—লড়াইয়ের পর—বাকী অংশ থেকে আরো ভালো একটুকরো গিয়েছে কাটা।'

'আপনার সাহায্যকারীরা কোথায়? এখানটায় এতো নিস্তব্ধ কেন?' ব্রেডিকিস প্রশ্ন করলো।

ইয়োকুবাস শ্লেজের ওপর খানিক জায়গা করে দিল আর আগন্তুক বসলো সেখানে।

'তারা সমবায় জমিতে কাজ করছে। তারা বলে যে অর্ধেক জমি চষা শেষ হয়েছে।'

আগন্তুক চুপ করে রইলো। চালা-ঘরের দিকে তাকালো সে এবং তারপর মাথাটা পিছনে হেলিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো। মেঘের ওপারে কোথাও সারসরা ডেকে চলেছে।

ব্রেডিকিস অবশেষে সুরু করলো, 'সংসারের নিয়মই এই। জমি থাকা আর না থাকায় এখন কিছুই এসে যায় না। এখন মন্দ থেকে ভালোকে যায় না পৃথক করা। আমার

কথাটা দেখে নিও, শীগ্‌গিরই একটা ঝড় উঠবে, আর যখন সেটা বইবে, খড়ের গাদার মত সব কিছুকে ওলোট-পালোট করে দেবে। সে লোকটা ঠিকই বলেছিল: 'প্রার্থনা করতে আর ছালা থেকে থলে তৈরী করতে শেখ, কারণ এমন একদিন আসবে যখন পথে রুটি ভিক্ষে করার জন্যে তোমাকে বেরুতে হবে।'

'কোন লোকটা?' এই চালাকির কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম না করতে পারলেও ভয় পেয়ে ইয়োকুবাস প্রশ্ন করলো।

'এটা কেবল আমার একটা কল্পনার কথা,' বুঝিয়ে না বলে ব্রেডিকিস উত্তর দিলো। 'উঃ কি গরম! গোল্লায় যাক। শিশিরের মতো ঘামগুলো যেন ফুটে বেরোচ্ছে!'

টুপিটা খুলে আস্তরের ছেঁড়া কাপড় দিয়ে কপালটা সে মুছলো।

'আমরা শুন্‌তাম যে ঘোটকীকে লাঙল টানতে শেখাতে হলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হয়। দড়া আলগা করে তাকে ইচ্ছেমত এগুতে দিতে হয়। এখানেও ওরা একটা সমবায় সমিতি দিয়ে স্বুরু করেছে। এই সমবেত ভাবে জমি চষার ফলে রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই ঘটবে না। এমন জাতের রাজনীতি যার ফলে কোনো চিহ্ন থাকবে না আমাদের

সম্পত্তির।' আগন্তুক সেই একই রহস্যময় ভাবে বলে যেতে লাগলো।

'কেন এটা চিহ্ন রাখবে না?' ইয়োকুবাস প্রশ্ন করলো, তার আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে!

'সমাজতন্ত্রবাদ ঘোষিত হয়েছে! কিন্তু তোমার ছেলে অনেক ভালো কোরে এটা বুঝিয়ে বলতে পারবে…'

সে উঠে দাঁড়ালো, শস্য তুলবার লম্বা হাতলওলা কাঁটাটাকে কাঁধের ওপর ফেলে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু ইয়োকুবাস নির্বাক থাকায় এবং কোনো প্রশ্ন না করায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে কি যেন বিড়বিড় করে বকতে বকতে সে চলে গেল।

'কোথায় যেন মেঘ গুড়-গুড় করছে। এ বছর ঝড়-বিদ্যুৎ সময়ের কিছু আগে হচ্ছে', বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো।

ইয়োকুবাসের এতো গুলিয়ে গিয়েছিল যে এখন সে আর ঠিক করতে পারলো না কে ঠিক। ব্রেডিকিস সম্বন্ধে যাই বলা হোক না কেন লোকটা যে খানিক খানিক জানে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখন তার বেশভূষা অপরিচ্ছন্ন, তার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য্য গেছে চলে, কিন্তু এ কথাটা সত্যি যে

একদা তার সরকারী কর্মচারী আর মহন্তদের সঙ্গে দহরম-মহরম ছিল।

লোকে বলে তার ছেলে বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে। কেউ কেউ আরো বলে চাষীরা তার জমি ভাগ করে দেবার পর থেকে ব্রেডিকিসের মাথাটা সামান্য খারাপ হয়েছে।

চাকার শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি ইয়োকুবাস দাঁড়িয়ে উঠলো। সে ঠিক করলো আচ্ছা করে ধম্‌কাবে তার ছেলেদের। কিন্তু তাড়াহুড়োয় শ্লেজের দড়িটায় পা আটকে নরম কাঠের গুঁড়োর ওপর উপুড় হয়ে পড়লো। যে সব মুরগিগুলো সেখানে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল ভয় পেয়ে সেগুলো ডানা ঝাপ্‌টাতে লাগলো।

'ভাঁড়ামি করার এখন সময় নয়।' আরো রেগে উঠে নিজেকে সে বল্‌লো। এক মাথা কাঠের গুঁড়ো নিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে উঠোন পেরিয়ে চললো সে। একটা খালি গাড়ীতে চেপে তার ছেলেরা উঠোনে ঢুকছিল। গোয়ালের দিকে চল্‌লো তারা। এই দেখে বৃদ্ধ তার গতি দ্রুততর করলো।

'কী-রে গতবার তোরা যথেষ্ট নিয়ে যাস্‌নি? তোদের নিজেদের জমি আর কাজকর্ম কিছুই নেই? তোরা শস্যগুলো তছ্‌নছ্‌ করছিস! ওঁছা লোকগুলোকে বিলিয়ে দেবার জন্যে তোরা কি ওগুলো ফলিয়েছিলি?'

একটা ছোট ডোবায় দাঁড়িয়ে পেণ্টুলুনটা হাঁটুর কাছ পর্যন্ত গুটিয়ে তুলে বড় ছেলে ইয়ুরগিস পা ধুচ্ছিল। সে তার বাবার দিকে চাইলো।

'এ সব যে নেহাৎ বাজে কথা তা তুমি জানো, বাবা। তুমি কি মনে করো বড়লোকদের জন্যে আমরা রুটি বানাবো?'

'না, কিন্তু তোরা তো এ কাজ করছিস কতগুলো ইতর লোক আর নানা ধরণের বাউণ্ডুলেদের জন্যে!'

'কবে থেকে তুমি উচ্চ-পদস্থ লোক হয়েছো, বাবা? দেখছি ইতিমধ্যেই ভুলে গেছ যে যতদিন না তুমি তোমার পাঁচটি 'ডেসিয়াটিনা'* পেয়েছিলে ততদিন পর্যন্ত সমস্ত জীবন তোমার গায়ে যে উকুণ চরতো সে কথাটা।'

'আমার পক্ষে সেগুলো যথেষ্ট ছিল। তোমরা কত পাবে?' ইয়োকুবাস চিৎকার করে উঠলো। মাথাটা ঝাঁকালো সে, চারিদিকে কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়লো। 'এ সবের ভেতর থেকে রাজনীতি জন্মাবে। একদিন তোরা দুঃখিত হবি, কিন্তু তখন খুব দেরি হয়ে গেছে—তোরা নিজেরাই সেধে চাইছিস একই পাত্র থেকে খেতে।'

'বাবা, জমিদারের ছড়ি না খেয়ে বুঝি মন কেমন

---

* রুশ দেশের জমির মাপ।

করছে?' তার ভাইয়ের দিকে চোখ মট্‌কে ছোট ছেলে আন্দ্রিয়ুস বল্‌লো।

'ঢের হয়েছে তোদের ঠাট্টা। সামলে চল্‌ নইলে তোর পিঠে ছড়িটা ভাঙবো।'

'বাবা, কথা আর বাড়িয়ো না! আমাদের দিকে এমন ভাবে তেড়ে এসেছো যে মনে হচ্ছে ব্রেডিকিস তোমাকে পুলিশ করে দেবে বলে কথা দিয়েছে। সব জোচ্চোরদের কথায় তুমি কান দিচ্ছো।'

'ঐ জোচ্চোর তোদের চেয়ে সব কিছু ভালো বোঝে।' তার বাবা কড়া জবাব দিলো।

মুরগিগুলো আবার বৃদ্ধের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো, আর ঘাড় বাঁকিয়ে মোরগটা তার দিকে স্থির ভাবে চেয়ে রইলো।

'তার যেটা ভালো, আমাদের সেটা বিষ। ঐ জ্ঞানী লোকটিকে তুমি বুঝিয়ে বোলো যে একটি পাত্র থেকে আমরা পরিজ খাবো না—প্রত্যেকে খাবো দশটি পাত্র থেকে। আর যেটা বাকি থাকবে তাকে দেবো সেটা চাট্‌তে।

ইয়োকুবাস বুঝলো ছেলের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তাছাড়া গোলমালে আকৃষ্ট হয়ে তার স্ত্রী তাকে ডাকছিল বাড়ীতে যাবার জন্যে।

'দেখিস পাহারাদার কুকুরগুলোকে বিরক্ত করার জন্যে কাঁধে ঝুলি নিয়ে তোদের না বেরিয়ে পড়তে হয়। এই সব "সমবায়-টমবায়" দিয়ে কিচ্ছু হবে না।' যেতে যেতে বৃদ্ধ গজরাতে লাগলো।

তার বাবার কথায় আহত হয়ে ইয়ুর্‌গিস সশব্দে ডোবাটার মধ্যে থুথু ফেললো।

'তোমার জমিদার আর তাদের জমিদারীগুলোই ভিখিরি সৃষ্টি করেছে। জানো সে কথা।' সে চিৎকার করে উঠলো, তার মুখটা টক্‌টকে হয়ে উঠেছে।

দ্রুতপায়ে ইয়োকুবাস কুটীরে ঢুকলো, মুরগিগুলোও তাড়াতাড়ি চল্‌লো তার পিছন পিছন। তার ছেলের শেষ কথাগুলো সে শুনতে পায়নি। অধিকাংশ সময়ই তার ছেলেদের কাছে তর্কে হেরে স্ত্রীর ওপর সে চোটপাট করে। ঘরে ঢুকে সে দেখলো তার স্ত্রী একটা বড় পাত্রের পাশে মেঝেয় বসে সসেজ ঠাসছে। কিছুদিন আগে তারা একটা শুয়োর মেরেছিল: এক সপ্তাহ ধরে সেটা কিছু খায়নি আর পরিবারের সবাই ভয় পেয়েছিল হয়তো সেটার অসুখ হয়েছে আর সেটা মরে যাবে।

এক কোণে তার লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে টেবিলের পাশে ইয়োকুবাস বস্‌লো। সে চটেছিল আর অপেক্ষা

করছিল তার স্ত্রীর কাছ থেকে ওস্কানি পাবার। কিন্তু তার বৃদ্ধ স্বামীকে সে ভালো করেই চিনতো। তার রাগকে সে ভয় করতো না। সে জানতো তার মনে আঘাত না দিয়ে কি করে তাকে শান্ত করতে হয়। অনর্থক তার কথা শোনার অপেক্ষায় থেকে অবশেষে সে বিড়বিড় করে উঠলো;

'সকাল থেকেই এই ঠাসবার কাজে তুমি লেগে আছ। আরো বেশীক্ষণ লাগালে সমস্ত মাংসটাই তুমি খরচ করে ফেলবে।'

'বেশ, যদি করেই ফেলি তাতেই বা কি?'

ব্যাপারটা কি? নিজের চোখকেই সে বিশ্বাস করতে পারলো না। তার স্ত্রী তার ক্ল্যারিনেট বাঁশিটার মুখটা খুলে ফেলেছে আর একটা নাড়ি লাগিয়েছে তার ওপর। নাড়িটার মধ্যে সে আঙুল দিয়ে মাংস ঠাস্ছে যেন সেটা একটা চুঙ্গী। ক্ল্যারিনেটটাকে সে সসেজ ঠাসার যন্ত্র বানিয়েছে। রাগে জ্ঞান শূন্য হয়ে মুহূর্তের জন্যে ইয়োকুবাস কথা খুঁজে পেলো না।

'তোমার মাথা খারাপ হোলো না কি, বুড়ি?'

'কেন, কিছু ভুল হয়েছে?'

'কেন, কিছু ভুল হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে তোমার তামাসা। আমাকে ওটা দিয়ে দাও। শীগ্গির দাও।'

'তুমি ওস্তাদ বাঁশি বাজিয়ে যা হোক। চিলেকোঠার থেকে এটাকে নাবিয়ে আনার জন্যে আমার ওপর তোমার কৃতজ্ঞ হবার কথা। পোকায় কেটে এটাকে ধুলো করে দিতো। এটায় তোমার দরকার নেই!'

'আমার দরকার আছে! অন্য মুখটা কোথায়?'

'এই যে, এখানে এখানে, নাও নাও। আমি খেয়ে ফেলিনি!'

ক্ল্যারিনেটের চর্বি মাখা দিকটা তার কাপড়টা দিয়ে মুছে তাকে সে সেটা দিয়ে দিলো।

ইয়োকুবাস ক্ল্যারিনেটটাকে প্যাঁচ কষে আঁট্‌লো এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে দারুণ ঝগড়া করে সমস্ত সন্ধেটা রইলো মুখ গোমড়া করে।

রাত্রে খাবার সময় সমস্ত ক্ষণ সে চুপ করে রইলো এবং রাত্রে সে ঘুমতে পারলো না; যারা ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে তাদের ওপর সে দারুণ চটলো। তার মনে হলো ইচ্ছে করে আবার তাকে তারা তার বৃদ্ধ বয়েসে একলা ফেলে গেছে। কেন কেউ তাকে বুঝতে চেষ্টা করে না? বাস্তবিকই তারা কি মনে করে যে ছেলেদের অমঙ্গল সে কামনা করে?

ঘুমের মধ্যে বার কতক তার স্ত্রী কথা বলে অন্য

পাশ ফিরে শুলো আর ইয়োকুবাস অনুভব করলো তার উষ্ণ নিশ্বাস। বরাবরই সে গভীর ঘুময়। এমন কি দিনের বেলাতেও যখন সে মাঠে শণ কাটবার কাজ করতো কিম্বা রান্নাঘরের পিছনকার সব্জি-ক্ষেতের আগাছা বাছ্‌তো, মাটিতে শুয়ে পারতো ঘুমিয়ে পড়তে। তা নিয়ে তাকে বকলে কিম্বা ঠাট্টা করলে সে বল্‌তো: 'তাতে কী। কখনোই আমি পুরো ঘুমতে পাইনি। প্রথমে আমাকে গরু চরাতে হতো আর তারপর ছেলেরা জন্মাতে লাগলো একের পর এক—কখনোই আমি দোল্‌নাটা তুলতে পারিনি…'

এমন কি যখন সে ঘুমতো তখনও ছেঁড়া কম্বল দিয়ে ক্রমাগত বাচ্চাকে ঢাক্‌তে ঢাক্‌তে তাকে দোল্‌না দোলাতে হতো। আর এখনো, ছেলেরা যখন বড় হয়েছে, অভ্যেসের দরুণ বিছানার একেবারে পাশ ঘেঁষে সে ঘুময়—তার হাতটা ঝুলে থাকে একদা যেখানে দোল্‌নাটা থাকতো। মাঝে মাঝে এমন কি দোলা দেবার মত এখনও সে হাত নাড়ায়। চোদ্দটী তার জন্মেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই এক বছরের হবার আগেই মারা গিয়েছিল। কেউ কেউ মারা গিয়েছিল দু'তিন বছর বয়েসে। কেবলমাত্র দু'জন বেঁচে রইলো—হয়তো সেটা ভালোর জন্যেই। অত বড় সংসারকে খাওয়াবার মতো খাবার কোথায় তারা পেতো?

যদিও অতটা সময় চলে গেছে, ইয়োকুবাসের মনে হতো এটা তো এই সেদিনের ঘটনা; মনে হতো তার প্রথম সন্তানকে এই মাত্র সে বুঝি গামলায় চুবিয়ে তুলেছে! কখনোই তাদের উপযুক্ত পরিমাণ রুটি কিম্বা আনন্দ জোটেনি··· তাদের ছেলেরা যখন বড় হয়ে উঠতো তাকে আর তার স্ত্রীকে একলা হাতে লড়তে হতো ক্ষুধার সঙ্গে—বছরের পর বছর ধরে। বসন্তকালে সর্বদাই বড়লোকদের কাছ থেকে শস্য ধার করতে হতো যতদিন না নতুন ফসল ফলে।

* * *

অনেকদিন ধরে উপত্যকায় কাজ চলেছে। কয়েক বছর ধরে অনাবাদি থাকায় জমিটা শক্ত হয়ে লাঙল আর মইকে বাধা দিচ্ছিল। মইটা যাতে টলমল না করে সে কারণে বড় বড় পাথর তার সঙ্গে বাঁধতে হয়েছিল। নতুন বাসিন্দাদের রোগা ঘোড়াগুলোর কষ্ট হতো লাঙল টানতে। যন্ত্রপাতি এবং ট্র্যাক্টর কেন্দ্রে কয়েকজন লোক গিয়েছিল একটা ট্র্যাক্টর চাইতে। হেলতে দুলতে এবং ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অবশেষে সেটা একদিন এসে পৌঁছল। ছেলের দল ছুটলো সেটা দেখতে; বয়স্করাও এলো। ট্র্যাক্টরের একাধিক ফলাগুলো মাটি কেটে দ্রুত সেগুলো পাল্টে চললো। কোনো বাধাই

সে মানে না। উপত্যকার কিনারে আগুনের ধোঁয়া উঠতে লাগলো: কুশ-ঘাসের স্তূপ ধিকি-ধিকি জ্বলছে। প্রতিদিন অধিকতর জমি হতে লাগলো চষা—এমন কি ঢালুর জমিটাও বাদ গেল না। দিনগুলো রৌদ্রে উজ্জ্বল এবং উষ্ণ।

কেবল দূর থেকে তার উঠনে দাঁড়িয়ে ইয়োকুবাস উপত্যকাটা দেখতো।

ট্র্যাক্টরটা পৌঁছবার পরে সে কাছে গেল। যন্ত্রটার কী যেন এক অদম্য আকর্ষণ আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মাঠের মধ্যে সেটাকে সে কাজ করতে দেখে—মাঝে মাঝে যেন নাক দিয়ে শব্দ করে, মাঝে মাঝে পিছনে ধোঁয়া আর শব্দ, আর সেটা গুঁড়ি মেরে সামনে আর পিছনে করে যাতায়াত। অভিমানমুক্ত হলে বৃদ্ধ হয়তো কাছে গিয়ে ভালো করে দেখতো। কিন্তু তখনো ছেলেদের ওপর রাগ তার পড়েনি। প্রত্যহ তবু সে সেই 'সমবায়' জমির দিকে হেঁটে যেতো, ঘাসের ওপর শব্দ করে ছড়ি চালিয়ে আর পথ থেকে ডোবার মধ্যে শুক্‌নো ডাল-পালা আর মাটির ঢেলাগুলোকে ফেলে। কখনো বা একটা ভরত পাখী চেঁচাতে চেঁচাতে তার পথ থেকে উড়তো। কখনো বা সেই বৃদ্ধ টুপি খুলে বাতাসকে তার পাকা চুল ওড়াতে দিয়ে ছোট এক পাহাড়ের ওপর বসতো। একদিন উপত্যকার দিকে

চেয়ে সে দেখলো ধূসর রঙের একটা ঘোটকীকে মই টানতে। 'ওটা এলো কোথা থেকে?' বিস্মিত হয়ে সে ভাবলো। 'জায়গাটা তো ঘোড়ায় ভরে যাচ্ছে।'

একটি ছোট বার্চ কুঞ্জের কাছে বাচ্চা এবং বয়স্কদের ভিড় জমে উঠেছে। খোলা জায়গায় লাঙল আর মই সারাতে ব্যস্ত মারৎসিঙ্কুস কামারও সেখানে রয়েছে। ইয়োকুবাস অবশেষে আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। একদিন সে এলো উপত্যকায়। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ জমিতেই ফসল বোনা হয়েছে। মাঝরাত পর্যন্ত চাষীরা কাজ করে যায়— ব্যস্ত থাকে নিজেদের জমি চষতে এবং 'সমবায় সমিতি'র কাজে সাহায্য করতে। বুঝতে পারার আগেই রাত হয়ে যায় আর বাপ-মা'রা বাড়ীতে ঘুমতে পাঠাতে চায় ছেলেদের। তারা কিন্তু আগুনের চারপাশে বসতে কিম্বা কুকুরের সঙ্গে দৌড়ুতে বেশী ভালোবাসে। অন্ধকার নেমে আসে সে অঞ্চলে আর ঢেকে দেয় মানুষদের। কেবল এখানে সেখানে কথা শোনা যায়। তাদের নিজেদের জমিতে দৈনন্দিন কাজ শেষ হবার পর নৈশ ভোজনের শেষে, রাত্রিতে কেউ কেউ বা উপত্যকায় ফিরে আসে।

অন্ধকারে প্রায়ই কেউ বলে:

'আজ রাত্রে কাজ করলে কী রকম হয় ইয়ুরগিস?'

'কেন নয়? আমি তো তৈরি। জ্যোৎস্নাও যথেষ্ট রয়েছে!'

তাদের স্বরে আত্মতৃপ্তির আভাস। আর দেশলাইর কাঠি জ্বালালে তাদের হাসিভরা মুখ যে কেউ দেখতে পারে। সর্বদাই যেন তরল হাস্য পরিহাস, মজাদার কথা কিম্বা ঠাট্টা ভরা গালিগালাজ কিম্বা তাজা ঘাসের দিকে এগিয়ে যাওয়া ঘোড়ার ওপর হম্বি-তম্বি শোনা যায়। অন্য কোথাও বা চাষীরা তাজা ঘোড়াদের লাঙলে জুতেছে, পরখ করে দেখছে বীজগুলো, কিম্বা আলোচনা করছে কি ভাবে কাজটা আরো ভালো করে করা যায়।

উপত্যকার নিয়মিত দর্শক হয়ে উঠলো ইয়োকুবাস। প্রত্যূষে তাড়াতাড়ি গরু-বাছুরগুলোকে খাইয়ে, কিছু জ্বালানি কাঠ কেটে হন্তদন্ত হয়ে সে চলে যেতো। তার কুটীরের গুমোট আবহাওয়া এবং তার নির্জন উঠোন থেকে বেরিয়ে মানুষের সঙ্গ পাবার লোভে নতুন এক আবেগ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতো। এ ব্যাপারে একলাই সে শুধু ছিল না। একই অনুভূতি বৃদ্ধ মার্টিনাস এবং সেই কামারের পিতাকে 'সমবায়' ক্ষেতের দিকে প্রত্যহ নিয়ে যেতো, আর যদিও তারা প্রায় কিছুই সাহায্য করতে পারতো না তবুও সব কাজেই তারা মনোযোগ দিতো।

'একসঙ্গে কাজ করায় আনন্দ আছে', তরুণ চাষীদের তাদের চারটি মই দিয়ে জমিকে সমান করতে এবং আলু পুঁততে দেখে ইয়োকুবাস একদিন বিড়বিড় করে উঠলো। আলুর ক্ষেতের ওপারে ইতিমধ্যেই গমগুলো অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে।

এক মত হয়ে মার্টিনাস বল্‌লো, 'সত্যিই। এতে অনেক বেশী আনন্দ রয়েছে—এভাবে কাজ করা সহজও বটে। মৌমাছিদের মত তারা লেগে থাকে আর তুমি ভাববার আগেই মৌচাকটা ওঠে ভরে।'

একটা খাঁজকাটা গুঁড়িওলা বার্চ গাছের তলায় দুই বৃদ্ধ বসে ছিল। সৈনিকদের এক শিরস্ত্রাণে, যেটাকে একটা পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। বার্চ গাছ থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে রস শিরস্ত্রাণে পড়ছিল ঝরে।

হাঁটু মুড়ে ইয়োকুবাস শিরস্ত্রাণটাকে কাৎ করে রস পান করলো। কোটের কোণ দিয়ে মুখটা মুছে ধীরে ধীরে রুমাল থেকে খুলে তার ক্ল্যারিনেটটাকে সে বার করলো। সযত্নে সমস্ত ফুটোগুলো আঙুলে চেপে যন্ত্রটার মুখটা থুথু দিয়ে ভিজিয়ে সে ফুঁ দিল।

'বহুকাল বাজাইনি। নিশ্চয়ই কুড়ি বছর কেটে গেছে', এক মুহূর্তের জন্যে ক্ল্যারিনেটটাকে তার কাছ থেকে সরিয়ে সে বল্‌লো।

বৃদ্ধের গাল দুটো উঠলো ফুলে, তাকাতে লাগলো মিটমিট করে আর তার চোখ দুটো উঠলো জলে ভরে। প্রথমে সুরটাকে চেনা কঠিন ছিল। বৃদ্ধের অপটু আঙুলগুলো এমন ভাবে নড়ছিল যে মনে হচ্ছিল যেন সূতো কাটছে।

দেখতে দেখতে কিন্তু নতুন একটি গান—যে গান তরুণরা এখন গায়—বিজয়োল্লাসে ভরলো সমস্ত প্রান্তর।

ইয়োকুবাসের ছেলেরা ঘোড়াগুলোকে থামালো। অন্যান্য কৃষক এবং যে সব মেয়েরা আলু বুনছিল তারাও শোনবার জন্যে এক মিনিট কাজ থামালো।

তার স্বেদাক্ত বুকে হাত বুলিয়ে ইয়ুর্গিস হাসি মুখে শুনে চল্‌লো—যেন সে শীতল জল পান করছে।

'যদি ভুল না হয়ে থাকে এ নিশ্চয়ই বাবা! ঐ বার্চ গাছের তলায় তিনি বসে আছেন।' অকস্মাৎ সানন্দে হেসে সে চেঁচিয়ে উঠলো।

কৃষকরা আবার কাজ সুরু করলো আর যে নালা তারা কেটেছে সেখানে আলুগুলো ফেলতে ফেলতে মেয়েরা চল্‌লো লাঙলের পিছন পিছন। ইয়ুরগিস বুঝলো যে ইয়োকুবাস ঐ গানের মধ্যস্থতায় তার ছেলেদের সঙ্গে ভাব করছে, ভাব করছে নতুন বীজ বোনার এবং নতুন জীবনের সঙ্গে… আর ভাবতে ভাবতে বাবা

যে কথাগুলো বলেছিল সেটার আবৃত্তি সে করলো: 'একই পরিবারভুক্ত হয়ে বেঁচে থাকা অনেক বেশী আনন্দের। কি করে যেন মানুষকে সেটা বেশী ভালো করে তোলে।'

এদিকে, সেই বার্চ গাছের ছায়ায় তার বাবা সমানে বাঁশি বাজিয়ে চললো।

অতীতের একটি পৃষ্ঠা

সুপারফসফেট

গলা বরফের তলায় চাষের জমিটাকে কালো দেখাচ্ছে। মাঠের উপর দিয়ে জলা জমির বিষণ্ণ গানকে ভাসিয়ে বাতাস যেন ছড় টানছে ঘাসের জঙ্গলে।

মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ, গাছের কুঁড়িগুলো এখনো ফোটেনি, জনশূন্য অরণ্য।

সার্মানতাই'এর ছোট গ্রামটা জলা জমিটার একেবারে পাশে। গাছপালা এখানে কম আর ফসলও কম ফলে।

যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর চতুর্দিকে জলা জমিটাকে ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মে মাসে মাঠের ঘাসে ফুল ফোটে; মাটি ঢাকে শ্যাওলায় আর জুনিপার গুচ্ছে বেরি ফলগুলো থোকা ভরে ফলে থাকে। কিন্তু গম আর গ্রীষ্মের ফসল খুব কমই এখানে ফলে।

গ্রামটার পাশেই ভদ্রলোকদের অরণ্য। জলা জমিটা সময় কাটায় বর্ষার জল, বাতাসের বিলাপ আর জুনিপার ফুলদের নিয়ে।

দু'এক দিনের মধ্যে অল্ডার গাছের আঠা-আঠা কুঁড়িগুলো যেন অশ্রুসিক্ত হয়ে হাসতে হাসতে তাদের বর্ষা-চুম্বিত হলদে ঠোঁটগুলো ফাঁক করে বসন্তের কথা ফিস-ফিস করে জানাবে এবং বাতাসকে ভরে তুলবে সুগন্ধে।

যে-সব গণতন্ত্রবাদী ভদ্রলোকেরা সে অঞ্চলকে শাসন করতো তারা সারমানতাই সম্পত্তিকে ভাগ করে দিয়েছে। তার খানিকটা অংশ ইয়ুরগিস বার্ত্কুস পেয়েছিল। অন্যান্য গ্রামের থেকে তফাৎ-এ ছিল সেই মাঠগুলো এবং ভলোস্ট কেন্দ্রে সেগুলো রেজেস্ট্রি করা ছিল একই ভূ-সম্পত্তির নামে। বার্ত্কুস শীঘ্রই এক প্রতিবেশী পেলো—তার পাশেই আর একজন নতুন বাসিন্দা বানালো তার কুঁড়ে।

সারা জীবনে ধরে বার্‌ত্‌কুস স্বপ্ন দেখে এসেছে একটুকরো কালো জমির মালিক হতে আর এখন সে রকম অনেকটা জমির সে মালিক। কিন্তু অতোটা জমি যেন একটা বোঝা; সেগুলো তার স্বাস্থ্য নষ্ট করে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে পচা গাছের গুঁড়ি এবং পাতার দুর্গন্ধ জলা জমি থেকে আসে; নিশ্বেস নিতে গিয়ে বার্‌ত্‌কুস হাঁপায় আর ব্যথা করে তার পা। রাত্রে তার বিছানায় সে বসে, কাশির যন্ত্রণায় হাঁপাতে থাকে।

তার যন্ত্রণা দেখে বিলাপ করে তার স্ত্রী, বিলাপ করে নিজের তিক্ত ভাগ্যের জন্যে:

'হায়, এ জঘন্য জায়গাটা ছেড়ে শীতকালের জন্যে আমরা কুঁড়ে গোছের যদি নতুন কিছু একটা বানাতে পারতাম!'

তার অসুস্থতা ছাড়াও বার্‌ত্‌কুসের অন্যান্য দুশ্চিন্তা ছিল। তার বীজ, দেনা, ফসল বোনা এবং তার কুটীরের জন্যে কাঠের তক্তাগুলো নিয়েও তাকে মাথা ঘামাতে হতো। তার বুড়ী এক ঘোটকী ছিল, সেটা এখন আর শক্ত খাবার চিবুতে পারে না। গরম জলে কুচো খড় ভিজিয়ে সেটাকে খেতে দিতে হয়। কোনো রকমে সে লাঙল আর গাড়ীটাকে টানতে পারে। বার্‌ত্‌কুস ভেবেছিল

সেটাকে কোনো এক কসাই'এর কাছে বিক্রী করে অন্য এক ঘোড়া কিনবে।

ভোর হলো। সরু রূপালী এক রশ্মি সেই ছোট জীর্ণ কুঁড়ের ছোট মলিন জানালা ফুঁড়ে এলো। আলুথালু একটা মাথা একবার দেখা গেল আর সেটা অদৃশ্য হবার পর রোগা আর খসখসে একটা হাত এলো বেরিয়ে।

কুঁড়ের ভেতরকার কাউকে উদ্দেশ্য করে বার্ত্কুস বল্লো, 'মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টিটা ধরেছে। কাউপ্কুস'এর সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে। আমরা দুজনে মিলে একটা মতলব আঁটবো।'

সেই কুঁড়ের ভেতর থেকে প্রথমে একটা তালিমারা কোটের পিছন দিকটা দেখা গেল আর তারপর বেরিয়ে এলো মানুষটা। তার ময়লা হাঁটু থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলে পেণ্টুলুনটাকে গুটিয়ে ফেললো সে। তারপর তার কাঠের জুতো থেকে খড়ের কুটিগুলো ঝেড়ে ফেলে ব্যথাভরা পাগুলো টেনে টেনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে চল্লো জলা জায়গাটার ওপর দিয়ে। তার নিজের কুটীরের মতো আর একটি কুটীরে পেঁাছে তার দরজা দিয়ে অদৃশ্য হলো।

সেই কুটীরের মধ্যে বসেছিল একটি বৃদ্ধ লোক। কয়েক জোড়া ছেলেদের চোখ এক টুকরো রুটীর উপর

নিবদ্ধ ছিল। একটা গাম্লার মধ্যে এক বাচ্চাকে দোলাচ্ছিল একটি স্ত্রীলোক, ধোঁয়ার জন্যে তার চোখ দিয়ে জল ঝরছিল। তাদের পাইপ থেকে ছাই ঝেড়ে, তামাক পাত্র থেকে আবার সেগুলোয় তামাক ভরে মাটির মেঝের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে পুরুষরা কথা বলতে সুরু করলো।

'আর এক সপ্তাহ এই ধরণের আবহাওয়া থাকলে ক্ষেতের কাজ আমাদের সুরু করতে হবে।'

'কে জানে। হয়তো গত বছরের মতো এ বছরেও বৃষ্টি সুরু হতে পারে।'

'হে ভগবান, সে রকম যেন না হয়!' বাচ্চাটাকে দোলাতে দোলাতে আকুল ভাবে স্ত্রীলোকটা বলে উঠলো। 'তাহলে আমরা শেষ হয়ে যাবো।'

'হয়তো আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে উঠবে। রুটীর অভাবের জন্যেই আমরা ভুগছি, এ-কথাই আমি বলতে চাই··· তুমি কি কিছুই যোগাড় করতে পেরেছো?' তার প্রতিবেশীকে প্রশ্ন করলো বার্ত্কুস।

'কোথা থেকে? ওটাই আমাদের শেষ রুটী। কি করে যে আমরা বাঁচবো সেটা ভেবেই পাই না। খাদ্য ছাড়াই আমাদের থাকতে হবে। এক সপ্তাহ আমি জল খেয়ে বাঁচতে

পারি. কিন্তু ওদের নিয়ে কী করবো?' ছেলেদের দিকে সে আঙুল দেখালো। 'ওদের খাওয়াতেই হবে, ওরা বোঝে না।'

'আমি চাই শুধু একটা ভালো বছর··· কেবল যদি গমগুলো মাত্র একবার ভালো করে ফলে। এ-জমিটা ভালো নয়: আপ্রাণ এর ওপর চেষ্টা করো, তোমার ঘাম দিয়ে সজল করো একে···' স্ত্রীলোকটি বল্‌লো। ক্ষুধা এবং অত্যধিক পরিশ্রমে সে শীর্ণ।

'তুমি এখন কী করছো? তোমার হাতে সময় আছে কি?' পাইপ থেকে ছাই ঠুকে ফেলতে ফেলতে বার্‌ত্‌কুস প্রশ্ন করলো।

'কেন?'

'যদি থাকে তাহলে আমরা গিয়ে সেই সুপারফসফেট (সার) সম্বন্ধে খবর নিতে পারি। শুনছি ধারে কেনা যায়। ইতিমধ্যেই সেটা হয়তো পেঁাচেছে···'

কাউপ্‌কুস তার স্ত্রীর দিকে তাকালো। তার স্ত্রীর চোখের জল শুকিয়ে গেছে।

ময়দা-মাখা বারকোষ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে বল্‌লো, 'যাওয়াই যাক। আমার 'ওনুচি'* কোথায় রেখেছো?'

---

* 'ওনুচি'—মোজার বদলে ব্যবহৃত কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ।

এক গাদা শুক্‌নো ডাল-পালার তলা থেকে তার স্ত্রী 'ওনুচি' টেনে বার করলো। বৃদ্ধ যখন সেগুলো পায়ে জড়াচ্ছিল বার্‌ত্‌কুস বল্‌লো:

'শরৎকালের মধ্যে কোনো রকমে আমরা দেনা শুধতে পারবো। গির্জের মাঠে কৃষি-বিশারদ বলছিলেন যে যদি আমরা সুপারফসফেট ব্যবহার করি তাহলে আমরা সতেজ গম পেতে পারি। তিনি বলছিলেন যে প্রুসিয়ার কুরল্যাণ্ডে লোকে অনেক দিন ধরে তাদের জমিতে সেটা ব্যবহার করছে। সে-কারণেই সেখানে গম ভালো জন্মায়।'

কুটীরের ভেতর থেকে পিছন পিছন নিঃশব্দে বেরিয়ে জলা জমি পেরিয়ে দ্রুত তারা চললো, কুঁজো হয়ে উঠলো তাদের পিঠগুলো। ধূমায়িত ছোট ছোট দুটী টিলার মতো তাদের বাসস্থানগুলি অনেক পিছনে পড়ে রইলো।

পাহাড়ে ওঠার পর বার্‌ত্‌কুস হাঁপিয়ে উঠলো; বাতাসের জন্যে সে খাবি খেতে লাগলো আর থামতে লাগলো প্রত্যেক পা যাবার পর। কাউপ্‌কুস তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

'আমি পারছি না··· আমাকে কাজ করতে না হলে এতোটা খারাপ অবস্থা হতো না। যখন তাড়াতাড়ি হাঁটতে কিম্বা ভারি কিছু বইতে হয় তখনই বাস্তবিক খুব খারাপ বোধ করি।'

খানিক পরে গ্রামে পৌঁছে ভরবিনায়া পথের শেষ প্রান্তে দোকানটা তারা খুঁজে পেলো। সেখানে তারা সার সম্বন্ধে খোঁজ নিলো।

দোকানের কর্মচারী তাদের বল্‌লো, 'আজকে ক্লাইপেডা থেকে খবর পাবো বলে আশা করছি।'

দোকানের চাষীরা জানালো যে খবরের কাগজে এই সারকে প্রশংসা করে এবং সবাইকে সেটা ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়ে লিখছে।

ভলোস্ট কমিটির বারান্দা এবং দোকানটা বিজ্ঞাপনে ছেয়ে গেছে। প্রত্যেক বিজ্ঞাপনে দুটী ছবি। আর তাদের মধ্যে যে তফাৎ তাই দিয়ে দেখানো হয়েছে এই সার ব্যবহার করলে কী রকম ফল পাওয়া যায়। একটা ছবিতে দেখানো হয়েছে একটা যন্ত্র পাকা সোনালি গম কাটছে; গাছগুলো দীর্ঘ আর জন্মেছে ঘন হয়ে। অন্য ছবিটায় দেখানো হয়েছে সাধারণ একটা মাঠ; গমের চারাগুলো ছোট ছোট আর একটী মাত্র লোক সেগুলো কাটছে।

সেদিন গভীর রাত্রে বার্‌ত্‌কুস তার স্ত্রীকে বল্‌লো যে সব কথা সে শুনেছে। এই সার সম্বন্ধে সে মনস্থির করতে পারেনি। যদি তার দাম দিতে না পারে তাহলে কী হবে? যদি অতগুলো টাকা জলে যায়? একটা কিম্বা দুটো

এমন কি তিনটে ছালাও এই জলা জায়গার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেটা ব্যবহার করতে চাইলে অনেক বেশী দরকার।

'এটার দাম কত?'

'সস্তা নয়। প্রতি ছালার দাম পঁচিশ করে। ওরা বলছে সুইডেন থেকে জাহাজে করে সেটা আনাচ্ছে আর বড় বড় বজরায় সেগুলো পাঠানো হবে এখানে। ডুবিনস্কিয়াই গ্রামে প্রত্যেকেই সই করেছে। কাউপ্‌কুস বক্তৃতা দিয়ে আমাকে রাজি করাতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি বলেছি যে প্রথমে আমার স্ত্রীকে কথাটা জানাতে হবে আর নিতে হবে তার মতামত। টাকাটা তো চট্‌ করে খরচ হয়ে যাবে। কিন্তু শোধ দেবার বেলায় একটা কাণাকড়িও কোথাও খুঁজে পাবে না।'

স্ত্রীলোকটি তার জ্বালা করা চোখ মুছলো।

'তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো। আমি কী বলবো আশা কর? যদি কাউপ্‌কুস আর সবাই এটা কিনতে চলেছে তাহলে এই সারটা নিশ্চয়ই ভালো হবে। কপালে যাই থাকুক, কেনা যাক। তুমি তো বল্‌ছো টাকাটার জন্যে তারা অপেক্ষা করতে প্রস্তুত··· হয়তো সেটার সাহায্যে বসন্তকালে এই জীর্ণ কুটীর থেকে আমরা বেরুতে পারবো। আমরা একটা কুঁড়ে ঘর বানাবো···'

'সবাই বলছে যে গম সার দিলে চটপট বড় হয়। পাদ্রীও তার জমি থেকে কখনো কিছু পেত না, কিন্তু সার দেবার পর কী রকম গম সে পেয়েছে তা যদি দেখতে! সেগুলো এতো লম্বা যে দেখলেই মন খুঁসিতে ভরে ওঠে! এই সারের কথা আগে কেউ কখনো শোনেনি। সবাই বলছে যে নতুন শাসকমণ্ডলীর মাথাতেই কথাটা খেলেছে। কাউপ্‌কুস কাগজে পড়েছে যে শাসকমণ্ডলী গরীবদের আরো বেশী সাহায্য করবেন। গত রবিবার কৃষি-বিশারদ বক্তৃতার পর সহরের একজন লোক বলেছিল যে আমাদের সই করা এবং সহযোগিতা করা উচিত এবং নতুন শাসকমণ্ডলী সবাইকার পক্ষে ব্যাপারটা সহজ করে দেবেন এবং নতুন বাসিন্দাদের দেবেন সার আর কাঠ। নিজের মনেই বললাম, শাসকমণ্ডলী যদি জনসাধারণের পক্ষে থাকেন তাহলে আমার নাম লেখানোই ভালো।'

বার্‌ত্‌কুস আর তার স্ত্রী সব কিছু ভালো করে বিবেচনা করে স্থির করলো যে তাদের গম ক্ষেতের সারের জন্যে তারা ধার নেবে।

দিনগুলো দীর্ঘতর হতে লাগলো। জলা জমিটায় ক্রমশ পাখীর ভিড় বাড়তে লাগলো। কোলাহলকারী ধূসর জল

পাখিরা এবং কালো সারসরা আকাশে ঘুরতে এবং জমিতে লাফিয়ে বেড়াতে লাগলো।

দূরে নেমান নদীতে একটা গাধাবোট বাঁশি বাজালো। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এবং ভোঁ ভোঁ শব্দ করতে করতে তিনটে সার ভরা বজরাকে সেটা টেনে আনলো।

ভলোস্ট'এর সর্বত্র থেকে তাদের গাড়ীগুলো নিয়ে কৃষকরা ঘাটে হাজির হলো। বজরাগুলো থেকে নৌকো, কাঠের তক্তা এবং নোঙর নীচে নামানো হলো আর সারটাকে খালাস করার কাজ সুরু হলো।

তাদের অপরিষ্কার এবং ছেঁড়া-খোঁড়া পোষাক পরে চাষীরা সমস্ত দিন ধরে ছালাগুলো বইলো। যারা সাহায্য করেছিল, দোকান থেকে তাদের সস্তায় সার বিক্রী করা হলো।

গাড়ি-ঘোড়া ছাড়াই হেঁটে এসে বার্ত্কুস স্বেচ্ছায় ছালাগুলো বইতে চাইলো। কাউপ্কুস যদিও ছালা ভর্তি সার তার পিঠে তুলতে সাহায্য করছিল, তবু সে তাকে চাইছিল নিরস্ত করতে।

'তোমার দম কম আর স্বাস্থ্যটাও খুব ভালো নয়। তোমার পক্ষে একটু বেশী দাম দিয়ে এই সার কিনে মানে মানে বাড়ী ফেরাই ভালো।'

প্রথম কয়েকটা ছালার ওজন বার্‌ত্‌কুস যেন বুঝতেই পারলো না। সত্যি বটে নদীর তীরে যেখানে ছালাগুলো গাড়ীতে ভরা হচ্ছিল সেখানে সে ছুঁড়ে ফেলছিল তার বোঝাগুলো, আর একটা গাড়ীর পেছন দিক খামচে ধরে জোরে জোরে হাঁপাচ্ছিল—কিন্তু এক মিনিট পরেই দেখা যেতে লাগলো আর একটা ছালা সে বয়ে আনছে।

'ঠাকুর্দা, হয় সরে দাঁড়ান নয় চট্‌পট্‌ কাজ করুন,' তাদের পিঠে ছালাগুলো নিয়ে যোয়ান চাষীরা তার পাশ দিয়ে যাবার সময় ফুর্তির হাসি হেসে বললো। সারের বোঝাগুলো তারা বইছিল যেন সেগুলো পালকের মতো হাল্‌কা।

একটা ছালাকে তার পিঠে তুলতে গিয়ে বার্‌ত্‌কুস হোঁচট খেলো। ছালাটা তার পিঠ থেকে পিছ্‌লে জলে পড়লো।

বজরা থেকে হাসির রোল উঠলো, সেখানে কে একজন উচ্চ কণ্ঠে ছালার সংখ্যা গুনছিল।

কাজ থেমে গেল। তাদের জামা-কাপড় পরা অবস্থাতেই দু'তিনজন চাষী জলে নেবে পড়লো। বজরার কর্তা জার্মান উচ্চারণে ছালাটা উদ্ধার করার জন্যে লোকগুলোকে তাড়া দিল।

দুজন লোক তীর থেকে বার্‌ত্‌কুসকে ধরে ধরে সরিয়ে নিয়ে গেল। চেহারাটা তার ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখগুলো ঘুরছে, আর তার কপালের আর হাতের শিরাগুলো দাঁড়িয়ে

উঠেছে। তক্তাটার কোণ ধরে জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে সে ঘড় ঘড় আওয়াজ করে রক্ত মাখা থুথু ফেল্‌লো।

'ওর ভেতরটা স্পষ্টই ফেটে গেছে…'

'কী বল্‌লে?'

'কিছু ভেবো না, ঠিক হয়ে যাবে। সাধারণত যে ভার বইতে পারি তার চেয়ে বেশী ভারি জিনিষ বইতে গিয়ে আমারও ও-রকম বহুবার হয়েছে,' বার্‌ত্‌কুসের কাঁধ ধরে তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে এক চাষী বল্‌লো। পরনে তার সস্তা কোট, দড়ি দিয়ে সেটা কোমরে বাঁধা।

আবার কাজ সুরু হলো আর অনেক রাত্তির অবধি চললো। যারা কাজ করছিল তারা থকে গেল।

সেই ঠাণ্ডা বসন্তের রাত্রে পথ আর জলা জমির ওপর দিয়ে বার্‌ত্‌কুস'এর কুটীরে তাকে নিয়ে এলো কাউপ্‌কুস। এখন সে আর কথা কইছে না। তার মাথাটা সারের এক ছালার ওপর এপাশ থেকে ওপাশ গড়াচ্ছে।

তার বিছানায় কয়েকদিন সে কাটালো, থুথুর সঙ্গে রক্ত উঠতে লাগলো তার। ক্রমশ আবহাওয়া সুন্দরতর হলো। জলা জায়গা পাইনকুঞ্জ এবং অনাবাদি ক্ষেতের ওপর আকাশটা দিনরাত পরিষ্কার হয়ে রইলো।

বার্‌ত্‌কুস জানতো তাকে উঠতে হবে, জান্‌তো শুয়ে থাকা তার পোষাবে না।

এক শান্ত সকালে যখন জলা জমির ধূসর ফুলগুলো ফুটেছে আর কোথায় যেন ওরিয়ল পাখী গান গাইছে, তখন বার্‌ত্‌কুস ক্ষেতে গেল। তার টুকরো জমিটার জন্যে সার ভরা থলিটা বইতে তার স্ত্রী সাহায্য করলো। তার কোঁচড়ে সার ভরে লাঙলের খাত ধরে বার্‌ত্‌কুস ছেঁচড়ে চল্‌লো। এলোমেলো আর যৎসামান্য গম ফলেছে; হল্‌দে হয়ে গেছে সেগুলো আর জমির সঙ্গে লেপ্‌টে রয়েছে।

মাটির কটু গন্ধে পরিপূর্ণ বাতাস স্থির হয়ে আছে। ভদ্রলোকদের অরণ্যে বিষণ্ন শব্দ শোনা যায়। সযত্নে বার্‌ত্‌কুস সার ছড়াতে লাগলো যাতে প্রত্যেকটা চারা সেই সার পায়। একটিও অঙ্কুর বা পাতার উপর পা না ফেলে চলতে সে চেষ্টা করলো। পিছন পিছন চললো তার স্ত্রী, যাতে সে পড়ে গেলেই তাকে ধরে ফেলতে পারে।

শেষ মুঠো সার ছড়াতে গিয়েই সে বুঝলো আর সে চলতে পারবে না। মাঠের ধারে বিশ্রাম নেবার জন্যে সে বসে পড়লো।

'শীগ্‌গিরই বৃষ্টি হবে··· আমাদের গমগুলোর কী জরুরী দরকার এই বৃষ্টিটার', ওরিয়ল পাখীর ডাক শুন্‌তে শুন্‌তে সে

বললো। তার সমস্ত শক্তি চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ভিজে মাটির ওপর সে মাথা চেপে রইলো।

কাঁদতে লাগলো তার স্ত্রী।

'তোমার কী হয়েছে? ইয়ুর্‌গিস··· তোমার মাথাটা আমার কোলে রাখো···'

তার খড়ের শয্যায় সে শয্যাগত হলো। দারুণ কাশির দমকে জেরবার হয়ে গেল সে। মুখ তার ভরে উঠতে লাগলো রক্তে।

একটু ভালো বোধ করার পরেই তার স্ত্রীকে সে ডেকে বললো, 'মারিয়ুক, ক্ষেতে গিয়ে দেখে একবার বলো গমের চারাগুলো কী রকম বাড়ছে।'

'ইয়ুরগিস, কিছু ভেবো না, ওগুলো ঠিকই আছে··· ইতিমধ্যেই আমি দেখে এসেছি। মাঠটা মখমলের মতো দেখাচ্ছে··· শীগ্‌গিরই গমের শিষ ধরবে।'

গাঢ় রঙের গমের চারাগুলো বড়ো হচ্ছিল। ডাঁটার ঝাড়গুলো সবুজ হয়ে উঠে দুলছিল বাতাসে।

'গমের চারাগুলো কেমন আছে? বলো আমাকে। গত রাতে কি বৃষ্টি পড়েছিল? খুব সবুজ হয়েছে কী? কোথাও ওগুলো নেতিয়ে পড়েনি তো?'

'না, ইয়ুর্‌গিস, না···'

'এখন অল্প বৃষ্টি হলে খুব ভালো হয়। আমাদের যে-রকম নুনের দরকার সে-রকমই দরকার এই বৃষ্টির,' সে বল্‌লো।

বসন্তের নীল আকাশের পর গ্রীষ্মের গভীর নীল আকাশ দেখা দিল। কলা, বিন্দুটী এবং নানা আগাছা, যেগুলোকে কেউ তুলে ফেলতো না, সেগুলো বার্‌ত্‌কুসের জানালা ঢেকে ফেলে যেন লজ্জিত ভাবে ভেতরে উঁকি মারতে লাগলো।

সারের দামের দরুণ টাকার প্রথম চিঠি দোকান থেকে পাঠালো। সেটা পৌঁছবার পর অসুস্থ মানুষটার কাছ থেকে বার্‌ত্‌কুসের স্ত্রী লুকিয়ে ফেললো।

একটা সপ্তাহ কেটে গেল, তারপর আর একটা। সমস্ত সম্পত্তি নিলামে বিক্রী করার ভয় দেখিয়ে দ্বিতীয় চিঠি এসে পৌঁছল। তার স্ত্রী কিন্তু লুকিয়ে ফেললো সেটাও। বার্‌ত্‌কুসকে ভালো করে তোলার এবং তাকে দুর্ভাবনা থেকে বাঁচানোর জন্য সব রকম ক্ষতি স্বীকার করতেই সে প্রস্তুত।

এক মাস পরেও বার্‌ত্‌কুসকে যখন গ্রামের মধ্যে দেখা গেল না, দোকানের খাজাঞ্চি নিজেই এলো তাকে দেখতে। পুলিশ নিয়ে পুলিশের গাড়ী করে সে এলো। অসুস্থ লোকটাকে উত্তেজিত এবং তার স্ত্রীকে আতঙ্কিত করে সেই জীর্ণ কুটীরের দরজায় তারা ধাক্কা দিলো।

'কোনোখান থেকেই টাকার জোগাড় আমি করতে

পারিনি··· আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন যে আমি অসুস্থ। মাটি খুঁড়ে তো আর টাকা বার করা যায় না।’

ধরা গলায় বার্‌ত্‌কুস পুলিশের কাছে অনুনয় করে বল্‌লো:

‘দেখুন, চেয়ে দেখুন এই সুন্দর গমের ক্ষেতের দিকে। এগুলো পাকলে কাণাকড়ি পর্যন্ত আমি শোধ দেবো। দয়া করুন।’

খাজাঞ্চি আর পুলিশ বেরিয়ে গেল। কিন্তু এক মিনিট পরে বার্‌ত্‌কুসের স্ত্রী, জানালার পাশে যে দাঁড়িয়েছিল, আর্তনাদ করে উঠলো:

‘দেখো, দেখো, কী ওরা করছে। ওগো ভালো লোকেরা, বাঁচাও, দেখো ওরা কী করছে। ওরা পা দিয়ে দল্‌ছে গমের চারাগুলোকে। মাপ্‌ছে ওরা মাঠটা। মাপছে মাঠটাকে পা দিয়ে!’

প্রানান্ত চেষ্টা করে বার্‌ত্‌কুস মাথা তুললো। তার কপালে দাঁড়িয়ে উঠলো নীল শিরাগুলো। আর একটা লাঠি মুঠো করে ধরে, তিন মাসের মধ্যে এই প্রথম, সে দাঁড়িয়ে উঠলো।

‘দাঁ··· ড়া দাঁ··· ড়া··· মজা ওদের দেখাচ্ছি··· একবার ওরা স্পর্শ করুক না···,’ তার হাত আর নীলচে ঠোঁট অস্বাভাবিক রকম কাঁপতে লাগলো।

কিন্তু জানালাটার কাছে পেঁৗছবার আগেই, তার স্ত্রী দৌড়ে কাছে আসার আগেই, অকস্মাৎ সে দুম্‌ড়ে-মুচকে, তার সস্তা কাপড়ের সার্টটা হাত দিয়ে বুকের কাছ থেকে ছিঁড়ে মেঝের ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়লো।

সে রাত্রে আর সে আর্তনাদ বা চীৎকার করলো না··· জলা জমিটার ওপর তারারা যখন ফুটলো শান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো, মুখ হাঁ করে।

ওরকম অদ্ভুত সুন্দর গ্রীষ্ম সচরাচর দেখা যায় না। বার্‌ত্‌কুসের গোয়ালের উপরকার দোদুল্যমান এল্‌মের শুকনো শাখাগুলো হলদে ফুলে ভরে উঠলো। ভেড়ার দল তার গুঁড়িটার ছাল খেয়ে ফেলার পর যে রোয়ান গাছটা ক্রমশ শুকিয়ে আসছিল, সেটাও ভরে উঠলো ফুলে।

তার জীর্ণ কুটীর থেকে প্রতিবেশীরা বার্‌ত্‌কুসের কফিনের পিছন পিছন চললো। গাড়ীর সামনে বসে ছিল কাউপ্‌কাস, ঘোড়াটাকে ছপ্‌টি মারছিল এগুবার জন্যে। কয়েকটি স্ত্রীলোক হাঁটছিল পিছনে।

প্রশান্ত সকাল। জলা জমির অন্য পার থেকে কাস্তের শব্দ ভেসে এলো। ইতিমধ্যেই চাষীরা ফসল কাটতে বেরিয়েছে।

গম ক্ষেতের পাশাপাশি কফিনটা আসার পর শোভাযাত্রীর দল অরণ্যের পাশের পথের দিকে মোড় ঘুরলো। হঠাৎ একটা বাতাস বইলো আর সেই হলুদ-রঙা গমের ক্ষেতের হ্রদে উঠলো যেন ছোট ছোট ঢেউ। পিতল রঙের ফসলের ভারি ভারি গুচ্ছগুলো কফিনের উপর আছড়ে পড়তে লাগলো।

প্রায় মাঝ পথে এসে, যখন তারা প্রায় ক্ষেতটা পেরিয়ে এসেছে, বিধবা কাঁদতে সুরু করলো। ওঠা-নাবা করতে লাগলো তার স্বর যেন সে মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়ে কফিনটাকে জড়িয়ে ধরছে আর আছড়ে পড়ছে সেটার ওপর।

'আমি এখন এক্কেবারে একলা, একেবারে একলা সমস্ত সংসারে। তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেছ… কে এখন আমার দেখাশোনা করবে…'

পথের মাঝখান থেকে গাড়ীটা মোড় ঘোরার পর তিনটি স্ত্রীলোক একটি স্তোত্র আওড়াতে লাগলো। বিধবার কান্না হয়ে উঠলো স্পষ্টতর…

এখানে কিন্তু ভদ্রলোকদের রিবাট অরণ্য তাদের পথ রোধ করলো; নানা রকম শব্দ ভেসে এলো সেখান থেকে, তার পরাক্রান্ত স্বর সেই কান্না এবং স্তোত্রকে দিলো ডুবিয়ে।

খরগোস

সবে চষা ক্ষেতের ওপর দিয়ে একরাতে আমি আর আমার ভাই গিয়েছিলাম কেঁচো খোঁজবার জন্যে পদদলিত এক গোচারণ মাঠে। এ-ধরণের জলা জমিতে প্রচুর কেঁচো পাওয়া যায়। দেখতে দেখতে আমাদের টিনের পাত্রগুলো প্রায় ভরে উঠলো। বাড়ী ফিরে ভোর পর্যন্ত আমরা ঘুমতে পারি।

মাঠের পাশ দিয়ে পায়ে চলা এক পথে আমার ভাই যখন লণ্ঠনটা নিবুতে যাচ্ছে তখন এক খড়ের গাদার পিছনে আমরা একটা খসখস শব্দ শুন্‌তে পেলাম। অন্ধকারের মধ্যে লণ্ঠনের চকিত আলোয় ঘুমে ভারি ভীত একটি মুখ মুহূর্তের জন্যে আমি দেখতে পেলাম। আর তারপর দেখলাম দৌড়ে পালানো দুটো খালি পা।

'ওটাই খরগোস। দৌড়ে পালাচ্ছে। বেচারাকে আমরা ভয় পাইয়ে দিয়েছি,' আমার ভাই বল্‌লো, আর লণ্ঠনটা নেভাবার আগে তার ঠোঁটে দেখা গেল চকিত হাসির রেখা।

'খরগোস কোথায়?' হতবুদ্ধি হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম। 'মনে হোলো যেন একটা মানুষকে দেখলাম।'

'ওটা তো মানুষই। ওর ডাক-নাম হোলো খরগোস', খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন আমার ভাই বললো।

'রাত্রে কেন তাহলে সে ভবঘুরেদের মতো ঘুরছে? ও কি পাগল? নাকি ভিখিরি?

'না ভিখিরি ও নয়,' অন্ধকারের দিকে আঙুল দেখিয়ে আমার ভাই হেসে বললো। 'ঐখানটায় অরণ্য দেখতে পাচ্ছো? ওটা তারই। ভলোস্ট'এর বড়লোক-চাষীদের ও একজন।'

আমার ভাই আমার মতো নয়। স্থানীয় অঞ্চল অপরিচিত নয় তার। বহুকাল এখানে সে শিক্ষক ছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের এবং তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে খবর সে ভালো করেই রাখতো।

খরগোশ সম্বন্ধে যে গল্পটা আমায় সে বলেছিল পাঠকদের সেটা জানানো উচিত বলে আমি মনে করি।

পঁচিশ বছর আগে বানিস নামে এক কৃষক তার খামারে তাকে কাজ দিয়েছিল। তার ধৈর্য্য এবং পরিশ্রমের কথা সমস্ত গ্রামের মধ্যে শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়লো। প্রথম বারো মাসের পর আবার সে যখন দ্বিতীয় বছরের জন্যে বানিসের কাছে কাজে লেগে রইলো, প্রতিবেশীরা হলো তখন অত্যন্ত বিস্মিত। তখন থেকেই খামারের অন্যান্য মজুরদের মতো তাকে নাম ধরে না ডেকে শুধু 'খরগোস' বলে উল্লেখ করতে লাগলো।

কোনো মজুরই বেশীদিন বানিস'এর কাছে কাজ করতে পারেনি। পরিশ্রমের সব রকম ভারি কাজ করানো ছাড়াও কঞ্জুষ আর রাগি-স্বভাব প্রভু তাদের আধ-পেটা খেতে দিতো।

যে বছর খরগোস বানিস'এর কাছে কাজ করতে এসেছিল সেটা ছিল দুর্বৎসর এবং সস্তা বেতনে দিন-মজুর

পাওয়া যেতো। দু'মাপ গম, তিন মাপ আলু, এক জোড়া জুতো আর ওভারকোটের মাপের একটা কাপড়ের বদলে খরগোস সারা বছর ধরে সব কিছু কাজই করতো—ক্ষেতে সার দিতো, লাঙল চষতো, ফসল কাটতো, গরু চরাতো, দড়ি পাকাতো, যন্ত্রপাতি সারাতো আর সহরের পেষাই-কলে যেতো। তাছাড়া, অন্য কাজ থেকে সময় পেলে, তার প্রভুর স্ত্রীকে মাখন তোলার কাজে সাহায্য করতো, সব্জি-বাগানটারও করতো তদারক। কী শীত কী গ্রীষ্ম, সূর্যোদয়ের আগে উঠতো সে, আর তারপর হয়তো যেতো গরু চরাতে নয়তো ক্ষেতের কাজে। বর্ষা, গ্রীষ্ম, শীত—কিছুই তার উৎসাহকে দমাতে পারতো না। অন্ধকার যখন এতো ঘন হয়ে উঠতো যে মাটীর সঙ্গে লাঙলের তফাৎ বোঝা যেতো না, কেবল তখনই শেষ হতো তার কাজ করা। বার্লি কিম্বা গমের রুটি দিয়ে মাঠেই ভোজন-পর্ব সে শেষ করতো—ফসল কাটার সময় চাষীরা কখনো গরম খাবার নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাড়ীর পিছনে ঘুমতো 'খরগোস,' শীতকালে যেখানে আলু এবং অন্যান্য শাকসব্জি সঞ্চয় করে রাখা হতো। বছরে মাত্র একবার গ্রীষ্মকালে যখন সে উনুন-ধার থেকে সরে খড়ের মাচায় যেতো, তখন তার গদিটা তাজা খড় দিয়ে হতো ভরা। এতে তাই

অবাক হবার কারণ নেই 'খরগোস' সেখানে যখন ইঁদুরের বাসা আবিষ্কার করতো।

কেবলমাত্র ছুটির দিনে সে অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশীক্ষণ পারতো ঘুমতে। সে-সব দিনের আগের সন্ধেয় তার মাথা, ঘা'গুলো এবং ছড়ে-যাওয়া পা'গুলো সে ধুতো আর অসংখ্য ক্ষত স্থানে লাগাতো গলা চর্বি।

বিশ্রামের এই-সব দিনে গ্রামের যুবকদের সঙ্গে 'খরগোস' কখনো অলসভাবে সময় কাটাতো না। রান্নাঘরে তার কর্ত্রীকে সে সাহায্য করতো—সর্বদাই সেখানে তার জন্যে থাকতো কিছু না কিছু কাজ। তার অবসর সময়ে এখানে কাটাতে সে ভালোবাসতো—দেখতো তার প্রভুর স্ত্রীকে জামার হাত গুটিয়ে, সুন্দর হাত দিয়ে ময়দা মাখতে মাখতে গান আর গল্প করে চলেছে। গান গাইতে সে ভালোবাসতো আর যখন সে গাইতো মনে হতো যেন কোন এক গভীর ভাবাবেগ তাকে ভর করেছে। গভীর দীর্ঘশ্বাস সে ফেলতো আর তার বুক দুলে উঠতো আর অশ্রুকণা দেখা যেতো তার চোখে।

সে ছিল স্নেহপ্রবণ, 'খরগোস'কে কখনো বকতো না। প্রায়ই সে তার হয়ে স্বামীর সঙ্গে তর্ক করতো। কিশোরী বয়েসে সে ছিল সুন্দরী আর হাসি-খুসি, কিন্তু

এ-বাড়ীতে যখন সে গৃহিণী আর ক্রীতদাসী হয়ে এলো, তার সৌন্দর্য শীঘ্রই পড়লো ঝরে। বানিস যদিও বয়েসে তার চেয়ে ছিল অনেক বড় তবুও সে তাকে গঞ্জনা দিতো বাচ্চা না হবার জন্যে। তার স্ত্রী সামান্য অবাধ্যতা প্রকাশ করলেই এক অদম্য রাগে সে ফেটে পড়তো। সে রকম সময় যদি তার স্ত্রী জানাতো তারও কিছু অধিকার আছে বানিস তৎক্ষণাৎ বসে যেতো সম্পত্তিটা ভাগ করতে। কখনো কখনো এ ব্যাপারে অনেক ঘণ্টা কেটে যেতো। খামার থেকে গুদোমে, সেখান থেকে কুটীরে সে ছুটোছুটি করতো। হাতের কাছে যা পেতো সেগুলোকে সশব্দে সে ছুঁড়ে ফেলতো—বিরাট একটা স্তূপ জমে উঠতো। মাখনের পিপেগুলো উল্টিয়ে চিলেকুটরি থেকে শূয়োরের মাংস, চর্বি, চাদর আর সূতোগুলো এনে সে চেঁচাতো:

'ভিখিরি'র বেটী, তুই কি বলতে চাস এসব জিনিস সঙ্গে করে এনেছিস? আমার জন্যে এই যৌতুকগুলো কি এনেছিলি তুই? উত্তর দিচ্ছিস না কেন?'

বাড়ীতে সে সময় কোনো আগন্তুক এলে তুমুল ঝগড়াটা পরিবর্তিত হতো বানিসের ধন-দৌলতের প্রদর্শনীতে। আগন্তুকের সামনে তার পাগলামো থামতো না, উপরন্তু এই বৃদ্ধ যেন আরো উত্তেজিত হয়ে তার জামা-কাপড়ের গাদা,

শূয়োর আর ভেড়ার চামড়াগুলো দেখাতো। আর বলতো সেগুলো সে রোজগার করেছে রক্ত জল করে। সবশেষে বার করতো সে একটা দোল্‌না, সেটা কিনেছিল তার স্ত্রী। এ-ধরণের হেনস্তায় তার স্ত্রীকে বাড়ী ছেড়ে পালাতে হতো। কিন্তু তাতে কোনো ফল হতো না। জোর করে স্বামী তাকে প্রতিবেশীদের কাছ্ থেকে ধরে আনতো আর সে তার বাপমা'য়ের কাছে আশ্রয় নিতে গেলে তারাই তাকে পৌঁছে দিতো বাড়ীতে।

এমন কি তার মাও তার বিলাপে কান দিতো না।

'মাঝে মাঝে তোর স্বামী ক্ষেপে ওঠে,' সে বল্‌তো। 'কোনো রকমে তাকে মেজাজ দেখাতে হবে তো, তাই সে পাগলের মতো রেগে ওঠে। আমার কথাটা শোন, বাছা, যখন সে চেঁচাবে তখন একেবারে ইঁদুরটি হয়ে থাকিস। কোনো উত্তর দিস না, তাহলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিস, তাহলেই তুই যা চাস তাই পাবি।'

'কিছু আমি চাই না। মা, শুধু তোমাদের কাছে আমাকে থাকতে দাও। আমি খেটে খেটে হাড় কালি করে ফেলবো আর মেঝে থেকে খাবার খুঁটে খাবো—কখনোই আমার কোনো অভিযোগ শুনতে পাবে না। এমন লোকের

সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছো যাকে আমি ঘেন্না করি। জীবন্ত আমাকে তোমরা কবর দিয়েছো,' কান্নায় ভেঙে পড়ে নিরাশ কণ্ঠে তাদের মেয়ে বল্‌তো।

'তোর মাথা খারাপ হোলো নাকি?' রেগে বলতো তার মা। 'নাকি সবাইকার সামনে আমাদের তুই অপদস্থ করতে চাস? কোথায় তুই ঠাঁই পাবি? সংসারে একলা পড়লে কে তোকে দেখবে?'

তার কন্যার বন্ধ্যাত্বের উপর এই কটাক্ষ। যুবতী মেয়েটী মেঝেয় আছড়ে পড়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সমস্ত দেব-দেবীকে স্মরণ করতো।

'একথা সত্যি নয়। না, না, না! ভগবান জানেন— এটা আমার দোষ নয়। এর জন্যে দায়ী সে।'

'ভগবানই কেবল বলতে পারেন তোর কোনো দোষ আছে কি না, কিন্তু লোকের চোখে তুই-ই দোষী', কঠিন স্বরে মা তাকে থামিয়ে দিতো। 'স্বামীর কখনোই কোনো দোষ হয় না, বিশেষ করে তোর মতো বড়লোক স্বামীর। নিজেকে সামলে নিয়ে বাড়ী যা। এক রত্তি জামা-কাপড় না থাকা সত্ত্বেও বানিস যে তোকে বিয়ে করেছে এর জন্যে ঈশ্বরকে তোর ধন্যবাদ জানানো উচিত।'

তার স্বামীর সঙ্গে এ-ধরণের এক ঝগড়ার পর তার বাপ-মাকে বলে সে ভুল করেছিল যে তার কোনো প্রেমিক থাকলে সন্তানের জন্ম সে দিতে পারতো। ব্যাপারটার কল্পনাতেই তার বাপ-মা আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। তাকে ধম্‌কালো তারা আর ফেরৎ পাঠালো তার স্বামীর কাছে।

বানিস'এর খামারে সব কিছুই বিষণ্ণ ও নিরানন্দ। মালিকের রাগী মেজাজের ছাপ সংসারের বাসনপত্র, বার-বাড়ী এবং যন্ত্রপাতির ওপরেও যেন প্রতিফলিত; গ্রামের মধ্যে তাদের কুকুরগুলি ছিল সবচেয়ে হিংস্র; বাগানের গাছগুলোকে দেখাতো বিষণ্ণ আর মনে হতো যেন ফলের ভারে নুয়ে সেগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পথিক এবং ভিখিরিরা তাদের দরজায় আঘাত করতে সাহস করতো না। আর যদিও প্রতি বছরই নতুন নতুন ধন-দৌলত তার জমা হতো— ভেড়ার চামড়া আর পশম, আর শূয়োরের মাংসের গাদা পচত, তবু তার সংসারের সবাই পেট ভরে খেতে পেতো না।

খিদে চাপতে ছোটখাটো বকুনি এবং অপমান সইতে অভ্যস্ত হয়েছিল 'খরগোস'। বাড়ীর অন্যান্যদের মতো তারও বয়েস বেড়ে চললো। প্রভূ তাকে বেতন দিতো না, কিন্তু সব কিছু সে নীরবে সইতো।

প্রতিবেশীরা জানতো যে 'খারগোস'টা পরিশ্রমী আর বিনয়ী মজুর আর প্রায়ই তারা চেষ্টা করতো বেশী বেতনের লোভ দেখিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনতে। তাকে ভাবতে দিতে এবং তাদের অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানিয়ে দিনের পর দিন সে তার জবাব মুলতুবি রাখতো। কিন্তু বড়দিন চলে গেল, চলে গেল 'সেণ্ট ইউরগিস-এর দিন'—তবু সে মন স্থির করতে পারলো না।

লোকেরা তার সম্বন্ধে বলতো, 'ওরকম বোকা লোকের ভালো কেউই করতে পারে না।'

নিষ্ঠুর প্রভুর কবল থেকে তাকে বার করে আনা গেল না বলেই লোকেরা তার ধৈর্য্য এবং বানিসের প্রতি একনিষ্ঠতাকে—যা এ পর্যন্ত সর্বত্র গুণ বলে প্রশংসিত হয়েছে—স্পষ্টতই পাগলামোর লক্ষণ বলতে লাগলো।

'খরগোস' তার কাছে পনেরো বছর কাজ করার পর এক রবিবারে মেঝেতে এক টুকরো রুটির ওপর বানিসের নজর পড়লো। সে তখন বিছানায় বসে একটা ধর্ম পুস্তক পড়ছিল। এই ধরণের সময় সর্বদাই সে অব্যবস্থার সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা সুরু করতো। বল্‌তো তার সমস্ত সম্পত্তি ছারখার হতে চলেছে। তার স্ত্রীর দিকে ভর্ৎসনার চোখে চেয়ে মেঝে থেকে রুটির টুকরোটা বৃদ্ধ নুয়ে কুড়ুতে গেলো।

আসন্ন গালাগালির জন্যে ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়েছে তার স্ত্রী। সেই মুহূর্তেই কিন্তু মেঝের ওপর নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়লো বানিস। তাকে বিছানায় শোয়াবার পর ঠক্ ঠক্ করতে লাগলো তার চোয়াল, কিন্তু দেখতে দেখতে শান্ত হয়ে এলো সে আর তার শরীরটা হয়ে উঠতে লাগলো শক্ত।

বানিস'এর মৃত্যুর এক বছর বাদে তার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করা হবার পরেই 'খরগোস'এর সঙ্গে বিধবার বিবাহ-চুক্তির কথা গির্জেয় ঘোষিত হলো।

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে আল্‌গা হলো লোকেদের মুখ। এখন বোঝা গেল 'খরগোস' কেন একগুঁয়ের মত বানিস'এর কাজ ছাড়তে অস্বীকার করতো। বোঝা গেল আসলে সে বোকা নয়—বল্‌লো সবাই; নিঃসন্দেহে বৃদ্ধের মৃত্যু অপেক্ষায় সে ছিল।

বর এবং বধূ গির্জেয় বেদির সামনে দাঁড়াবার পর লোকেরা দেখলো পঁয়তাল্লিশ বছরের বিশীর্ণ এক স্ত্রীলোক আর এক পুরুষকে তারুণ্যে উজ্জ্বল। এক মাথা তার সোনালী চুল। নবপরিণীতদের চোখে আনন্দের আলো ভীরুভাবে কাঁপতে লাগলো।

বানিস'এর সংসার এই ভাবে চলে এলো 'খরগোস'এর অধীনে। যে স্ত্রীলোকটী জীবনে কখনো প্রেম কী জানেনি,

জীবনে কখনো যে কোনো মিষ্টি কথা কারুর কাছ থেকে শোনেনি, তার সমস্ত সঞ্চিত আবেগকে সে উজাড় করে দিল তার দ্বিতীয় স্বামীর ওপর। তার স্বামীর প্রতিটি পদক্ষেপ সে সন্দেহের চোখে দেখত।

গ্রামের সমস্ত লোক হেসে উঠতো তা দেখে। তাদের প্রতিবেশীদের বাড়ীতে সে গেলে তার স্ত্রী দৌড়ে আসতো তার পিছন পিছন, বিশেষত সে বাড়ীতে যদি কোনো তরুণী থাকত। পেষাই-কল কিম্বা বাজারে যাবার সময় তার সঙ্গে যাবার জন্যে সর্বদাই সে বায়না ধরতো। কাজের জন্যে যখন তাকে থাকতে হতো বাড়ীতে বারবার সে এ-জানালায় সে-জানালায় আসতো তার স্বামী বাড়ীতে আছে কি না দেখার জন্যে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত গ্রামের মধ্যে শোনা যেতো আতঙ্ক এবং ঔৎসুক্যে ভরা এক তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠ:

'ইয়নাস, লক্ষ্মী ইয়নাস! কু-উ-উ…'

তার স্বর শুনে লোকেরা বলতো:

'মনে হচ্ছে 'খরগোস'টা যেন বাঁধাকপির ক্ষেতে আবার হারিয়ে গেছে…'

নবপরিণীতরা মনের সুখে এবং আনন্দে থাকতে লাগলো। বাড়ীতে শিশুদের অভাবের কথাটা মাঝে মাঝে সখেদে বলা হতো বটে, কিন্তু 'খরগোস'কে দেখে মনে

হতো না সে খুব ঘাবড়ে পড়েছে। এদিকে স্ত্রীলোকটি কিন্তু আশা ছাড়লো না, ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে চললো। লজ্জায় আরক্ত হয়ে তোৎলাতে-তোৎলাতে তার অসুখের কথা সে বলতো। কিন্তু ফল কিছু হলো না।

দুটি শান্তিপূর্ণ বছরের পর অনেক দিন ধরে যে দুর্ভাগ্য সংসারটার ওপর ওৎ পেতে ছিল 'খরগোস'এর ওপর সেটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো। পঙ্গু হয়ে গেল তার স্ত্রীর পা দুটো। আর ডাক্তাররা জানালো সে অসুখ সারবার নয়।

সংসারের কাজ করার জন্যে একটি দাসী নিযুক্ত করতে হলো আর ঝামেলা এড়াবার জন্যে তারা নিয়োগ করলো এক বৃদ্ধাকে—যে দুর্বল আর কানে কম শোনে আর যে আধ-পাগ্‌লাটে ধরণের। 'খরগোস'এর স্ত্রী কিন্তু তাকেও সন্দেহ করতে লাগলো। তার নিজের বিবেচনা অনুসারে যখন তার স্বামী সেই বৃদ্ধার সঙ্গে রান্নাঘর কিম্বা গোয়ালে বেশীক্ষণ ধরে কথা কইতো, সে চেঁচিয়ে ডাকতো তাকে :

'ইয়নাস, কেন তোমার অত দেরি হচ্ছে? আমার সঙ্গে কথা কইতে মিনিটও দাঁড়াও না; আর এদিকে তুমি ঐ বুড়ী পাগলীটার সঙ্গে ক্রমাগতই বক্‌বক্‌ করে চলেছো।'

শীতকালে গরম কাপড় জড়িয়ে রুগ্না স্ত্রীলোকটী

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তার বিছানায় বসে থাকতো জানলার কাছে। পালক বাছতে বাছতে কিম্বা পশমকে মস্থণ করে তুলতে তুলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে জানালার সাদা কাঁচের উপর সে শ্বাস ফেলতো আর উঠোনের দিকে চেয়ে দেখতো তার স্বামী গরুগুলোকে খাওয়াচ্ছে।

পরিষ্কার সুন্দর দিনে অনেক দুর পর্যন্ত যখন দেখা যেতো কখনো সে দেখতো তুষার আচ্ছন্ন বিরাট উপত্যকায় একটি লোক পার হয়ে চলেছে, ধোঁয়া উঠছে কাঠের গাদা থেকে আর তার ওপর ঝল্‌সানো হচ্ছে একটা শূয়োরের মৃতদেহকে, কিম্বা দেখতো পথ দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে, ঘটকদের নিয়ে চলেছে একসারি শ্লেজ। গ্রীষ্মকালে গরমের সময় 'খরগোস' তার স্ত্রীকে মাঠে নিয়ে যেতো আর গাছের ছায়ায় তার বসার জায়গা করে দিতো। এখানে তার স্ত্রী হয় কোনো বাছুরকে আদর করতো, কিম্বা হাঁস-মুরগিদের খাওয়াতো, কিম্বা কাপড় সেলাই করতো। কখনো কখনো সে ঘুমিয়েও পড়তো।

তার স্ত্রী স্নান করতে চাইলে গাড়ি চাপিয়ে 'খরগোস' তাকে নদীতে নিয়ে যেতো, সেখানে নিজে তার জামা-কাপড় বদলে সযত্নে নিয়ে যেতো তাকে জলের মধ্যে—যেমন করে লোকে ভঙ্গুর পাত্র নিয়ে চলে। তাকে

স্নান করতে সাহায্য সে করতো, জামা-কাপড় পরাতো আর গাড়ি চড়িয়ে ফিরিয়ে আনতো বাড়ীতে।

শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও মনের দিক থেকে 'খরগোস'এর স্ত্রী দিনে দিনে ছেলে মানুষ হয়ে উঠতে লাগলো। মাঝে মাঝে এমন তার খেয়াল চাপ্‌তো যা তরুণী মেয়ে কিম্বা কোনো বাচ্চাকে সাজে। প্রেম পরিপূর্ণ নয়নে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে সে বলতো:

'ইয়নাস, সোনা আমার, আমায় তুমি কোলে তুলে নাও।'

হাতের কাজ ফেলে 'খরগোস' বাধ্য লোকের মতো স্ত্রীকে কোলে তুলে বাড়ীময় ঘুরে বেড়াতো।

'ইয়নাস, সোনা আমার, ভাবো তো আমি কী চাই। মধুও নয়, চিনিও নয়, সব জিনিসের চেয়ে মিষ্টি যেটা। ইয়নাস, সোনা আমার আমায় তুমি চুমু খাও!'

সে তাকে চুম্বন করতো, তার স্ত্রী কিন্তু তাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়তো না।

'আর একবার। এইখানটায়, এই ছোট্ট জায়গাটায়।'

ইতিমধ্যে 'খরগোস'ও আর আগেকার মত নেই। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রমশ কুঁজো হয়ে আসতে লাগলো, পাতলা হয়ে গেল তার মাথার চুল আর মুখের

উপর ফুটে উঠলো রেখা চিহ্ন। তা সত্ত্বেও স্বামী এবং স্ত্রীর বয়েসের পার্থক্য এখনো স্পষ্ট দেখা যায়। অপরিচিত লোকেরা তার স্ত্রীর হাত চুম্বন করে সবিনয়ে তাকে প্রশ্ন করতো:

'তোমার মা?'

সময় কেটে যেতে লাগলো আর 'খরগোস'এর স্ত্রী হয়ে উঠতে লাগলো আরো ছেলেমানুষের মতো। প্রতি মুহূর্তেই নতুন নতুন আদর-যত্ন সে চায়। একদা এক সন্ধের সুরুতে, কোনো যন্ত্রণার কথা উল্লেখ না করে এবং কোনো দীর্ঘশ্বাস না ফেলে, যেন ঘুমিয়ে পড়ছে এইভাবে, হঠাৎ তার স্ত্রী মারা গেল।

দারুণ জাঁক-জমক করে 'খরগোস' তার স্ত্রীর শেষ-কৃত্য করলো। মোমবাতির ওপর দুহাতে সে টাকা খরচ করলো আর তার স্ত্রীর আত্মার শান্তি কামনায় ব্যবস্থা করলো গির্জের ঘণ্টা বাজাবার। গোরস্থানে এক ছোট কবরে তাকে সমাহিত করা হলো। বানিস'এর কাছ থেকে তার স্ত্রী যতো জমি পেয়েছিল তার দ্বিতীয় স্বামী সবটাই পেলো।

তার মৃত্যুর ঠিক আগেই তার স্বামী যে বড় বাড়ীটা তৈরী করতে সুরু করেছিল 'খরগোস'এর স্ত্রী সেটা দেখার জন্যে বেঁচে রইলো না। বাড়ীটায় ছিল কাঁচে ঢাকা বারান্দা আর টালির ছাদ।

পুরো একবছর ধরে 'খরগোস' শোকের পোষাক পরে রইলো। বাড়ীটা শেষ হবার পর জবাই করা হলো একটা শূয়োর, পিঠে হলো ভাজা আর বিয়ার হলো চোলাই করা। যে সব প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার বিশেষ সহৃদয়তা ছিল গৃহপ্রবেশ-উৎসবে সবাই তারা আমন্ত্রিত হলো।

কৃষি-ক্ষেত্র সংলগ্ন সেই বাড়ীতে এই প্রথম অতিথিরা অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ বোধ করলো। সেই সুন্দর বাড়ীটা তারা পরিদর্শন করলো, শস্যের কুটরী এবং আলমারিগুলো দেখলো — ভতপূর্ব গৃহকর্তা সেগুলো ভরে রেখেছিল বনাত এবং ক্ষৌম-বস্ত্র দিয়ে। 'খরগোস'এর ধন-দৌলত তারা প্রাণ ভরে দেখলো, জানালো তাকে অভিনন্দন এবং গৃহকর্তার বদান্যতার জন্য করলো প্রশংসা। তারপর রকমারি খাদ্যে ভরা টেবিলের পাশে তারা বসলো।

প্রথমে প্রায় নিঃশব্দেই পানাহার চলছিল। কিন্তু কোমর-বন্ধগুলো আলগা করার পর আলাপ-আলোচনা প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। তার হাসাবার ক্ষমতা, খালি গেলাসগুলো চটপট ভরে তোলার দক্ষতা, প্রতিটি প্রশ্নের বিনীত উত্তর দেওয়া এবং আলাপ-আলোচনাকে চালু রাখার ক্ষমতা দেখে অতিথিদের অনেকেই নিমন্ত্রণকারীর আতিথেয়তায় চমৎকৃত হলো। অতিথিদের এই সব মন হরণ করলো। খামারের

এক ভূতপূর্ব চাকর হিসেবে 'খরগোস'এর সঙ্গে তারা ব্যবহার করলো না। এমন ভাব দেখালো যেন সে উত্তরাধিকার সত্রেই কর্তা হয়েছে, যেন সে তাদের সমানে সমান।

পানাহারের ফলে নিমন্ত্রণকারী এবং অতিথিদের মুখ যখন আরক্ত হয়ে উঠলো 'খরগোস'কে একজন বললো যে তার বিয়ে করা উচিত। প্রত্যেকেই কথাটার অনুমোদন করলো যেন সেটা আগে থেকেই স্থির করা ছিল।

'ঠিক কথা, ইয়নাস, বহুকাল থেকে তুমি বিপত্নীক।'

নতুন বড় বড় ঘরগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে প্রতিবেশীরা গুঞ্জন করে উঠলো, 'এ রকম প্রাসাদে একলা লোক!'

'বাজি ফেলে বলতে পারি ওর জন্যে আমি এক পাত্রী খুঁজে বার করতে পারবো!'

মাথা নাড়াতে নাড়াতে 'খরগোস' হেসে উঠলো, আর তার প্রতিবেশীদের মধ্যে দারুণ রেষা-রেষি পড়ে গেল তার ভবিষ্যৎ আনন্দ এবং নতুন সংসারের উদ্দেশে তার গেলাসের সঙ্গে গেলাস ঠুকে মদ্য পান করার জন্যে। তাদের মধ্যে একজন উঠে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে, হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে তার দুই গাল চুম্বন করলো।

'তুমি ইচ্ছে করলে আমার জাবেলকে বিয়ে করতে পারো।'

আর একজন লোক তাকে ঠেলেঠুলে ‘খরগোস’এর কাছে গিয়ে বল্‌লো, ‘এক মিনিট দাঁড়াও! দাঁড়াও! আমার টেকলি কি দোষ করলো?’

কম করে পাঁচ জন গণ্যমান্য চাষী জড়িয়ে ধরলো ‘খরগোস’কে, তার কলার ধরে টানলো তাকে, তাকে চুম্বন করলো এবং চাপড়ালো তার পিঠ। সে কিন্তু তাদের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে কোচের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে দারুণ কাঁদতে লাগলো। অতিথিরা সবাই চুপ হয়ে গেল। ভেবে পেলো না কিসে তারা তাকে দুঃখ দিয়েছে। কী বলতে হবে ভেবে না পেয়ে তারা মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগলো। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ‘খরগোস’ উঠলো, তখনো হাত দিয়ে তার মুখ ঢাকা।

‘পঁচিশ বছ্‌র ধরে আমার অবস্থা ছিল শোচনীয়’, কম্পিত স্বরে সে বললো। ‘পনেরো বছর ধরে ষাঁড়ের মতো খেটেছি আর কুকুরের মত অর্দ্ধভুক্ত থেকেছি, আর শুনেছি কেবল অপমান এবং গালাগালি। তারপর দশ বছর সেই মানুষকে আমি কোলে করে ঘুরেছি যাকে আমি ঘৃণা করতাম আর সয়েছি সবাইকার উপহাস।’

হাত দিয়ে তার অশ্রু মুছে ফেলে লাফ দিয়ে সে

দাঁড়ালো, তারপর একটা মগ খপ্ করে তুলে নিয়ে বিয়ার ভরে পান করে সশব্দে সেটা টেবিলে নাবিয়ে রেখে, সে চিৎকার করে উঠলো:

'আজ কিন্তু এখানকার প্রভু আমি। আমিই!'

আবার সে হাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছে অকস্মাৎ দারুণ খুসি হয়ে উঠলো:

'কিন্তু সে সব চুকে গেছে। ভরে তোলো তোমাদের গেলাস, পান করো, খাও!'

টেবিলের চারিদিকে আবার সবাই হাসি খুসি হয়ে উঠলো। আবার গান আর হাসির রোল উঠলো।

এক ইস্টারের দিন গির্জা থেকে বাড়ী ফেরার পথে দুটো বার্চ গাছের মাঝখানে একটি মেয়েকে 'খরগোস' দুলতে দেখলো। তার সুন্দর পা দুটো টান টান হয়ে সামনে রয়েছে আর বাতাসে উড়ছে তার সোনালী চুল। অনেক উপরে দুলে সে উঠছে আবার আসছে নেমে—চমৎকার লাগছিল তাকে দেখতে। দোলনাটা ঘিরে একদল যুবক দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটির যৌবন আর প্রাণশক্তি 'খরগোস'এর বুকে দাগ কাটলো। সে স্থির করলো প্রতিবেশীদের কাছে মেয়েটি সম্বন্ধে খবর নেবে। এখন সে ধনী এবং গণ্যমান্য লোক। মেয়েটি তাকে পছন্দ করবে কি না এ নিয়ে একেবারেই সে মাথা ঘামালো না।

তাকে যে তার পছন্দ হয়েছে এটাই যথেষ্ট। শীঘ্রই তার নতুন স্ত্রীকে সে বাড়ী নিয়ে এলো। মেয়েটি তার জন্যে যৌতুক বা প্রেম কিছুই আন্‌লো না, বয়েস ছিল তার কম আর দেখতে ছিল সে সুন্দর। কয়েকমাস তারা শান্তিতে কাটালো। কিন্তু শ্রীঘ্রই, মেয়েটি তার বাবা-মা'র সঙ্গে কিম্বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে বলে যখন, তখন অনুপস্থিত হতে লাগলো, 'খরগোস'এর দুশ্চিন্তা হতে লাগলো। বাইরে যাবার সময় সর্ব্বদাই সে প্রফুল্ল এবং সদয় থাকতো, আর ফেরার পর যদিও সে ভান করতো কিছুই হয়নি, তবুও সর্বদাই থাকতো একলা আর মন-মরা হয়ে। তাছাড়া, প্রতিবেশীদের সন্দেহের কয়েকটা অসাবধানী কথা কানে আসায় মনে তার সন্দেহের উদ্রেক হলো।

তাদের কাছ থেকে 'খরগোস' জানতে চেষ্টা করলো গোলমালটা কী আর শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পারলো যে তার স্ত্রীর একজন প্রেমিক আছে।

তাকে সে কাকুতি-মিনতি করে বললো, তর্ক করলো তার সঙ্গে, বোঝাতে চেষ্টা করলো এরকম হালচাল সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের মানায় না। কিন্তু তার যুবতী স্ত্রী সব কিছুই অস্বীকার করলো। কিন্তু যাবার সময় হলেই আগেকার মতো সে পালাতে লাগলো।

মেয়েটির বাবা-মা ধিক্কার দেবার চেষ্টা করলো তাকে, তার সঙ্গে তর্ক করলো এবং ভয়ও দেখালো— কিন্তু রুখতে তাকে পারলো না। কোনো না কোনো উপায়ে তার প্রেমিকের সঙ্গে সে দেখা করতে লাগলো। তার স্বামীকে আশ্বাস দিয়ে সে বললো যে সে ভ্রষ্টা নয়। বল্‌লো যে হিংসুটেদের কথাগুলোই যত নষ্টের গোড়া।

একদিন কিন্তু 'খরগোস' শুন্‌লো যে তার স্ত্রী উড়ু-উড়ু স্বভাবের জন্যে ভর্ৎসিত হওয়ায় রেগে এবং একটুও লজ্জিত না হয়ে জোর গলায় বলেছে:

'একটা বুড়োর সঙ্গে থাকবার জন্যে আমি বিয়ে করিনি। ও ভেবে দেখুক ওর প্রথম স্ত্রী সম্বন্ধে ও নিজেই কী বলেছিল! আমি অবশ্যই ওরকম বোকামো করবো না! পঁচিশ বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকবো না আমি।'

কথাগুলো 'খরগোস'এর মনে লাগলো। সে ভয় পেয়ে উঠলো আর প্রতিবেশীদের কাছে অভিযোগ করতে লাগলো যে কতকগুলো লোক তাকে মেরে ফেলতে চায়, চায় তাকে বিষ খাওয়াতে, বাড়ী সমেত তাকে পুড়িয়ে মারতে।

এখন কেবল সে দিনের বেলাতে খামারের কাজ-কর্ম দেখে, শুধু নিজের রাঁধা খাবার খায়, তার স্ত্রীর দেওয়া কিছুই গ্রহণ করে না, আর রাত্রে যায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে।

গ্রীষ্মকালে খড় কিম্বা গমের গাদায় সে শোয়, প্রতিবারই পরিবর্তন করে তার স্থান। শীতকালে প্রতিবেশীদের গোয়ালে, স্নানের জায়গায় কিম্বা কামারশালে সে রাত কাটায়। দারুণ সে বুড়ো হয়ে পড়েছে, সব কিছুতেই তার অবিশ্বাস, আর সর্বদাই নিজের মনে বিড়বিড় করে।

গল্পটা শেষ করে আমার ভাই বললো, 'যে-ভাবে সে চলেছে তাতে শীগ্‌গিরই পাগল হয়ে যাবে।'

আমার মনে পড়লো 'খরগোস'এর ফ্যাকাশে, ভয়-পাওয়া মুখ, অন্ধকারের মধ্যে লণ্ঠনের আলোয় এক ঝলক দেখা, মনে পড়লো তার দৌড়ে পালানো খালি পা দুটো।

'আমার মনে হয় ইতিমধ্যেই সে পাগল হয়ে গেছে।'

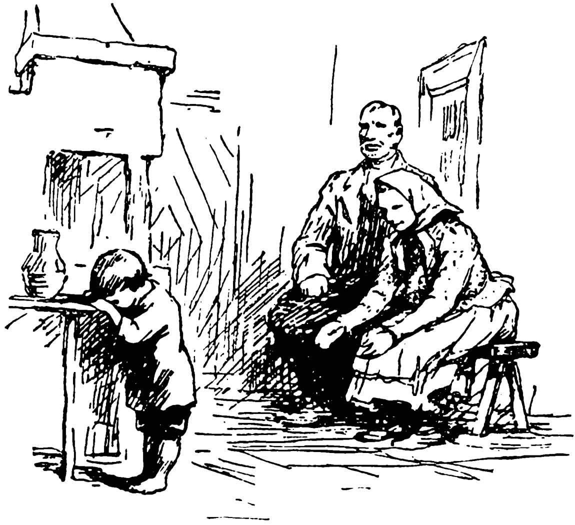

আমার বাবা

আজ যখন আমি আমার ঘরে ধূমায়িত আগুনের সামনে বসেছিলাম তখন এই সব স্মৃতিগুলো আমার মনে এলো।

পরিবারের পঞ্চম সন্তান ছিলাম আমি। পৃথিবীতে যখন আমি এলাম, দুর্বল আর করুণ চেহারা নিয়ে, কেউই তখন আনন্দিত হয়নি। মা বলেছিলেন যে আমি মারা

গেলেই তাঁর এবং আমার পক্ষে ভালো হতো। কিন্তু আমি বেঁচে রইলাম; আর আমার মা দিব্যি গেলে বলতে লাগলেন যে আমিই তাঁর শেষ সন্তান জন্মালাম—ঠিক যেরকম শপথ করে তিনি বলেছিলেন তাঁর তৃতীয়, এবং পরে চতুর্থ সন্তান জন্মাবার পর।

বড়'র থেকে সুরু করে আমাকে নিয়ে পর্যন্ত চেহারায় কারুর কোনো বিশেষ পার্থক্য ছিল না—মটরদানার মত আমাদের প্রায় সবাইকে দেখতে একই রকম ছিল—দৈর্ঘ্যে শুধু আমাদের মধ্যে ছিল সামান্য তফাৎ। আর সত্যি, ছড়ানো মটরদানার মতো, প্রায় প্রতি বছরেই আমরা হতে লাগলাম হাজির। একে অন্যকে দোলনা থেকে সরিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে নিজেদের দাবী জাহির করে মায়ের বক্ষ-লগ্ন আমরা থাকতাম। তাঁর প্রসবের সময় প্রতিবার নিজেকেই নিজে মা বলতেন: 'আমার কোলে একটা আর আর একটা রয়েছে আমার নাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে।'

ময়দা গুঁড়ো মাখা অবস্থায় একদিন দু'জন লোক আমার বাবাকে বয়ে নিয়ে এলো যে কারখানায় তিনি কাজ করতেন সেখান থেকে। সে ঘটনা ঘটে যখন আমার বয়েস তিন বছরের একটু বেশী। আমরা শুন্‌লাম যে একটা যন্ত্রের সঙ্গে আটকে গিয়ে, যতক্ষণ না সেটা তাঁর হাত এবং বুকের

হাড়গুলোকে চূর্ণ করেছিল ততক্ষণ তিনি আছড়ে চলেছিলেন।

উক্ত দুর্ঘটনা আমার মনে গভীর রেখাপাত করলো, ছিনিয়ে আনলো আমাকে শৈশবের স্বপ্ন-জগৎ থেকে। এখনো স্পষ্ট আমার বাবার রক্ত-মাখা চেহারা আমি দেখতে পাই। এখনো শুন্‌তে পাই তাঁর শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার মা'র আর্তনাদ, তাঁর শেষহীন বিলাপের সুর— পথের অন্য প্রান্ত থেকেও সেই বিলাপধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। স্ট্রেচারে সেই ভয়াবহ বোঝা হাজির হবার পর আমার চার ভাই লুকিয়ে পড়লো এবং উঠন থেকে তাদের বুক-ফাটা কান্না আমি শুন্‌লাম। দেখতে দেখতে প্রতিবেশীদের নিয়ে বাড়ীটা ভরে উঠলো। তাদের মধ্যে ছিলো মতেয়ুস খুড়ো— একটা চোখ তার কাণা। নস্যি নিতে মতিয়ুস খুড়ো ভালোবাসতো আর তার সেই 'খরগোসের ঝোল' নিয়ে পিছনে লাগতো।

'এই "খরগোসের ঝোল"টা তোরা কেউ চেখে দেখবি নাকি?' আমাদের মধ্যে কোনো একজনকে প্রশ্ন করে সে কান ধরে তুলতো।

কুটীরের মাঝখানে মাটীর মেঝের ওপর দুটি তক্তার মধ্যে আমার বাবাকে শোয়ানো হলো। সাদা কাপড় দিয়ে আপাদমস্তক মুড়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর। যে সব স্ত্রীলোকরা

ঘরে ঢুকছিল, প্রত্যেকেই তারা মৃতদেহের কাছে গিয়ে, কাপড়ের খুঁট তুলে একবার দেখে সরে যাচ্ছিল। তারপর নিজেদের মধ্যেই তারা বলাবলি করছিল যে হাতটার সঙ্গে মুখটার তফাৎ বোঝা যায় না।

এই সময় প্রতিবেশীরা একেবারে অন্য রকম ব্যবহার করছিল। কোনো শব্দ তারা করছিল না, আর ফিস্‌ফিস করছিল এক রহস্যজনক কণ্ঠে। দাড়িওলা গাড়ীর মিস্ত্রি, সর্বদাই যে মাতাল অবস্থায় লোকেদের জানালার তলায় মুরগির ডাক ডাকতো—এখন সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাতের মধ্যে টুপিটাকে মোচড়াতে মোচড়াতে এবং সভয়ে চোখ মিটমিট করতে করতে।

সমস্ত রাত ধরে আমাদের কুটীরে লোকজন আসতে লাগলো, জ্বলতে লাগলো মোমবাতি আর আওড়ানো হতে লাগলো স্তোত্র।

ঘরের বদ্ধ বাতাস মোমের গন্ধে ভরে উঠলো। মা আর তখন ফোঁপাচ্ছেন না। দুটি স্ত্রীলোকের মাঝে বসে এমন ভাবে তিনি মাথা নাড়াচ্ছিলেন যে মনে হচ্ছিল যে তিনি বুঝি দুলতে দুলতে ঘুমিয়ে পড়বেন—তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে, মসৃণভাবে আঁচড়ানো তাঁর চুল। বসেছিলেন তিনি মৃতদেহের পায়ের কাছে।

সকালে আমার বাবাকে কফিনে ভরে কয়েকজন লোক মতেয়ুস খুড়োর গাড়ীতে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যেই পথটা ভরে উঠেছিল দর্শকদের ভিড়ে। শ্রমিকদের মধ্যে একজন, আমার বাবাকে যে আগের দিন বয়ে এনেছিল, ছিল সেখানে।

হাত-পা ছুঁড়ে সে বলছিল, 'যদি আমি আর একটু আগে আসতে পারতাম! কিন্তু কী করেই বা লোকে জানবে? পেষাই-কলটা যখন আমরা থামালাম তখনো ও নড়ছিল। একবারও ও গোঙায়নি বা চিৎকার করে ওঠেনি।'

'বেচারা শহীদ হয়ে গেছে, শান্তি পেয়েছে তার আত্মা', একটি স্ত্রীলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো। 'কিন্তু এই সব বাচ্চাদের কী দশা হবে? তাদের মা'ই বা কী করবে?'

আমরা, ছেলের দল, কফিনের দুপাশে বসলাম। পুরোহিতের সাদা পোষাক পরা দুজন পতাকাধারী শোভাযাত্রার আগে আগে চললো। মতেয়ুস খুড়ো লাগামে হ্যাঁচকা টান দিলো আর চলতে সুরু করলো গাড়ীটা।

দিনটা পরিষ্কার, রৌদ্রে উজ্জ্বল। চেরি গাছগুলোতেও ধরেছিল থোকা থোকা সাদা ফুল— তারাও যেন পুরোহিতের

সাদা পোষাক পরে আমাদের গ্রামের রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে; রাস্তার শেষে একজায়গায় বিরাট এক সাদা মেঘের মত হয়ে মিশে গেছে তারা। তাদের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাড়ীর ভিজে ছাদগুলো, রৌদ্রে সেগুলো উঠ্‌ছে ঝক্‌ঝক করে।

গির্জে থেকে আমরা সবাই কবরখানায় গেলাম। শোভাযাত্রা শীঘ্রই পাহাড়ের চারিধারে ছড়িয়ে পড়লো। গির্জের বিষণ্ণ ঘণ্টা-ধ্বনি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এলো— সীমাহীন মাঠের মধ্যে গেল মিলিয়ে। সূর্য ক্রমশ উপরে উঠতে লাগলো। শবযাত্রীদের অনেকেই খালি মাথায় হাঁটছিল আর কপাল থেকে মুছ্‌ছিল স্বেদ-বিন্দু।

গোরস্থানের গাছগুলো তাদের ঘন ডালপালার ছায়া দিয়ে আমাদের ঢেকে দিলো। একটা তাজা বালির ঢিবিতে কার যেন একটা কোট পড়ে রয়েছে— বার্চ গাছের ঝোলা ডালপালা ঘষটে কফিনটা এগুতে লাগলো সেখানে। ঢিবিটার পিছনে দেখা গেল একটি লোকের আরক্ত মুখ। শীঘ্রই লোকটা গর্তের ভিতর থেকে ঢিবিতে চড়ে তার কোদালটা মাটিতে আছড়ে ফেললো। লোকরা কবরটার চারদিকে এমনভাবে ভিড় করে এলো যেন এ দৃশ্য তারা কচিৎ দেখতে পায়।

প্রত্যেকে নতজানু হয়ে বসার পর, একটা চৌকো টুপি মাথায় পরে পুরোহিত কবরের ওপর পবিত্র জল ছিটোতে ছিটোতে বিড়বিড় করে একটি প্রার্থনা আওড়ে গেলেন। তোয়ালে দিয়ে ধরা কফিনটা ধীরে ধীরে নামানো হলো। প্রথম একমুঠো বালি কফিনের ডালাটার উপর বিষণ্ন শব্দ করে পড়ার পর, মতেয়ুস খুড়ো কবরের কাছে আমাদের নিয়ে এলো আর দেখিয়ে দিলো কী ভাবে আমাদের বাবার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে— যিনি কখনোই আর আমাদের কাছে ফিরে আসবেন না। আমার অন্যান্য ভাইদের মতো আমিও একমুঠো বালি নিলাম। আমার দৃষ্টি কিন্তু আবদ্ধ ছিল কোদালগুলোর ওপর, যেগুলো যেন খেলার ছলে কবরের উপর বালি আর পাথর কুঁচি ছুঁড়ে ফেলছে। কবরটা যখন ভরে উঠলো এবং তার ওপর যখন দেখা দিল একটা লম্বাটে ঢিবি— খুড়োর উপদেশটা তখন মনে পড়লো; আমার মুঠো ভরা উষ্ণ বালির চাবড়াটাকে আমি রেখে দিলাম।

দেখতে দেখতে গোরস্থানটা খালি হয়ে গেল। গাছের শন শন আওয়াজ হয়ে উঠলো তীক্ষ্নতর। তাদের নবীন ডালপালার ওপাশে কালো একটা মেঘ সূর্যকে আড়াল করে দিলো। পাছে বৃষ্টিতে ভেজে এই ভয়ে শেষ শবযাত্রীও বাড়ীর দিকে

দৌড়ুলো—কেবল দুটি মাত্র বুড়ো লোক একে অন্যকে ধরে কাঁকরের পথ দিয়ে লাগলো হাঁটতে; মাটিতে বুঁজে আসা এবং দীর্ঘ ঘাসে ঢাকা উপেক্ষিত কবরগুলোর মধ্যে কী যেন তারা খুঁজছিল।

মা'র মাথা ঘুরতে লাগলো। প্রতিবেশীদের মধ্যে কয়েকজন ধরে ধরে নিয়ে চললো তাঁকে। গাড়ীর মিস্ত্রির স্ত্রীর কাঁধে মাথা রেখে, ফটকের বাইরে তাঁকে আমরা অপেক্ষা করতে দেখলাম। জিভ দিয়ে রুমালের প্রান্ত ভিজিয়ে তিনি তাঁর মুখ এবং চোখ মুছে চললেন। গাড়ীতে বসে আমাকে তিনি কোলে তুলে নিলেন। বুড়ো অস্থিচর্মসার ঘোড়াটা তার ধূসর কেশরগুলো নাড়িয়ে খুট খুট করে ফিরে চললো—শুধু এবার তার বোঝাটা আগের চেয়ে হালকা।

স্পষ্টতই আমাদের সান্ত্বনা দেবার জন্যে অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মতেয়ুস খুড়ো বললো:

'আমাদের সইতেই হবে··· কারণ··· কী আমরা করতে পারি··· মেনে নিতেই হবে আমাদের। এই ভাবেই সংসার···'

যখনই দরকারী কিছু সে বলতে চায় তখনই তার অস্পষ্ট, গোলমেলে আর বড় বড় কথাগুলো জোট পাকিয়ে

ওঠে। আমার কিন্তু সে সময় মনে হচ্ছিল যে বড়রা'ই কেবল তার এই জ্ঞানগর্ভ কথাগুলো বুঝতে পারে।

বড় রাস্তাটায় পৌঁছবার ঠিক আগেই, আমাদের গাড়ীটা ডান দিকে মোড় নিয়ে একটা পাহাড়ে উঠতে লাগলো। আমাদের খুড়ো ভেবেছিলো যে এই দুঃখের ঘটনা থেকে আমাদের অন্যমনস্ক করার জন্যে বজ্র-দগ্ধ ওক গাছের পাশ দিয়ে দীর্ঘ এবং উচ্চতর পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই ভালো; গাছটার মধ্যে ছিল একটা সারসের পুরোণো বাসা। স্থানীয় লোকরা জায়গাটাকে পছন্দ করতো বেড়ানোর জন্য। খুড়ো আমাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন যে এখান থেকে পাঁচ পাঁচটা গ্রামের গির্জে দেখা যায়।

অতিশয় অশুভভাবে আমাদের যাত্রা শেষ হলো। মতেয়ুস খুড়ো ঠিক যখন জায়গাটার সমস্ত সৌন্দর্য দেখানো শেষ করে পেষাই-কলের দিকে যেতে সুরু করেছো, মা এমন ভাবে কাঁদতে লাগলেন যেন তাঁর বুকটা ভেঙে যাচ্ছে।

সশব্দ এবং সফেন জলের দিকে আমরা তাকিয়ে রইলাম। আমার ভাইরা ভয় পেলো যেন অভাবনীয় এবং ভয়ঙ্কর কিছু একটা দেখছে। পুরু ময়দা-গুঁড়ো ভরা তার বিরাট বিরাট চাকা নিয়ে বাস্তবিকই কলটাকে দেখাচ্ছিল একটা দৈত্যের মতো।

সেই যাত্রার পর অনেকদিন পর্যন্ত কলটার কাছে যেতে আমি সাহস পাইনি। অনেক দুঃস্বপ্ন সেটা আমায় দিয়েছিল।

* * *

আমার বাবার মৃত্যুর পর বাড়ীটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল। পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর কথা কইতে আমরা অস্বস্তি পেতাম, ভয় পেতাম উচ্চ কণ্ঠে কথা কইতে। এমন কি আমাদের খুড়ো কান ধরে আর তুলতো না। কিছুদিন ধরে আমরা আনন্দিত বোধ না করলেও, আমাদের বন্ধুদের চেয়ে নিজেদের দাম যেন বেশী—এরকম অনুভব করতাম। প্রতিবেশীরা আমাদের উপর বেশী মায়া দেখাতে লাগলো—রাস্তায় থামিয়ে, আমাদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের বাড়ীতে আসতে বলে তারা তাদের আপ্রাণ সহানুভূতি দেখাতে চেষ্টা করতো। প্রথমে আমাদের বন্ধুরা তাদের সমস্ত খেলনা নিয়ে আমাদের খেলতে দিতো। শেষের দিকে কিন্তু আমাদের আদর-যত্ন দেখে তারা হিংসে করতে লাগলো।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরের দিন সকালে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই মা জেগে উঠলেন, আগের দিন যে আলুগুলো রেঁধেছিলেন সেগুলো করলেন গরম, এবং আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভাইকে দেখিয়ে দিলেন কী করে আমাদের

খাবার দিতে হয়। তারপর তিনি চলে গেলেন। অনেক রাত্রে একেবারে জুবজুবে হয়ে ভিজে তিনি ফিরলেন, কিন্তু হাতে তাঁর একমুঠো শুক্‌নো ডালপালা। তারপর থেকে প্রতিদিন তিনি সব্জির বাগানে আগাছা তোলার জন্যে সূর্যোদয়ের সঙ্গে উঠতেন, উঠতেন শহরের ধনীলোকদের জল বইবার এবং কাপড় কাচার জন্যে, কিম্বা বজরায় জ্বালানি কাঠ ভরার জন্যে। প্রায়ই তাঁকে আমি দেখতাম সরু তক্তার ওপর দিয়ে দ্রুতপদে কোনো একটা বজরার ওপর উঠতে— জ্বালানি কাঠভরা ঠ্যালা-গাড়ীটাকে ধাক্কা দিয়ে এবং তাঁর লম্বা স্কার্টটাকে গুটিয়ে। তাঁর রোদে পোড়া স্নেহময় মুখটা রৌদ্রে চক্‌চক্‌ করে উঠতো এবং তাঁর পায়ের ডিমগুলো গাড়ীর চাকার তারের মতো উঠতো ঝলকে। ওভাবে তাঁকে দেখতেই আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো। দারুণ দেখাতো তাঁকে।

সমস্ত গ্রীষ্মকাল আমরা খুব আনন্দে ছিলাম। প্রতি সকালে আমাদের বালিশের তলায় কিম্বা এক্কেবারে মুখের কাছে রাখা কিছু না কিছু খাদ্য থাকতো, এদিকে উনুনেতে সর্বদাই চড়ানো থাকতো গরম এবং মুখরোচক খাদ্য। সন্ধ্যের সময় দৌড়ে গিয়ে মাকে আমরা বলতাম কি রকম ভালো

ছিলাম আমরা—আমরা ভালো ব্যবহার করলে সর্বদাই তিনি মুক্ত হাতে উপহার দিতেন।

শরৎকালে কিন্তু বজরাগুলোর যাতায়াত বন্ধ হলো, দেয়ালের ফাঁক দিয়ে সোঁ সোঁ করে দিয়ে এলো ঠাণ্ডা বাতাস, পাতলা বরফে ঢেকে দিল মাটি এবং কাজের জন্য আমার মা'র ডাক ক্রমশ কমতে লাগলো এবং প্রায়ই তিনি বাড়িতে থাকতে লাগলেন। তাতে আমাদের অবস্থার উন্নতি হলো না কারণ শীতের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে মাংস এবং তারপরে দুধ বাড়ী থেকে হলো অদৃশ্য। মতেয়ুস খুড়োর সঙ্গে মা'র উদ্বিগ্ন আলোচনা শুনে মনে হলো যে চলে-যাওয়া বজরাগুলো, শরৎকাল, ক্ষুধা, প্রয়োজনীয় জিনিষ—এগুলো যেন একই সূত্রে গাঁথা।

মাথা নাড়িয়ে খুড়ো বললো:

'অনেক দিন আগেই ঘোড়াটাকে আমি বিক্রী করে দিয়েছি। আর কী আমি করতে পারি? এরকম অবস্থা বেশীদিন চল্‌লে অনাহারে আমরা সবাই মরবো।'

'তোমার পক্ষে অত অসুবিধের হবে না। তোমার তো সংসার নেই। কিন্তু বাচ্চাকাচ্চাগুলোকে নিয়ে কোথায় আমি যাই? আমি ভয় পেয়ে গেছি। একটা কাণাকড়িও আমি রোজগার করতে পারি না আর তাদের খাওয়াবার

মতো কিছুই আমার নেই। মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে মনে হয় ওদের আর নিজেকে বরফের তলায় ছুঁড়ে ফেলি।'

'কী সব আবল তাবল বকছো! কিছু না কিছু একটা উপায় হবেই আর বসন্তকালে বড় ছেলেটাকে রাখালের কাজে কেউ হয়তো বহাল করবে।' তাঁকে সান্ত্বনা দিতে দিতে খুড়ো বল্‌লো।

'ধনীরা সর্বদাই তাদের সন্তানদের মৃত্যুর জন্যে শোক করে, কিন্তু ঈশ্বর যদি আমার কোনো একটি ছেলেকে নিয়ে নেন তাহলে অবস্থাটার উন্নতি হয়', বেপরোয়া স্বরে মা বললেন।

কাজ পেতে মা'র যখনই দেরি হতো প্রতিদিনই তিনি বেশী খিটখিটে হয়ে উঠতেন। কেউই আমরা তখন তাঁর রাগের হাত থেকে নিস্তার পেতাম না। আমাদের মধ্যে কেউ যদি ময়দার ঝোলটার দিকে চেয়ে নাক সিঁটকোতাম— সেসব দিনে সেটাই ছিল আমাদের একমাত্র খাদ্য— কিম্বা আরো ভালো যদি খেতে চাইতাম, মা জ্বলে উঠতেন আর কী ঘটছে বোঝবার আগেই তার কানগুলো উঠতো জ্বালা করে।

'যা দিচ্ছি তাই খা! ভিক্ষে করতে যাবার সময় কথাটার মানে তোরা বুঝতে পারবি।' মা কঠিন স্বরে বলতেন।

কিন্তু এ ধরণের তুমূল কাণ্ডের পর কুটীরের চতুর্দিকে আমরা পালাবার পরে মা'য়ের রাগ চট করে নিভে যেতো। আমাদের কাছে ডেকে সযত্নে তিনি মুছিয়ে দিতেন চোখ আর নাক। আমাকে কোলে নিয়ে বারবার তিনি বলতেন:

'আহা, বেচারা। কী দুর্দিনেই না তুই জন্মেছিস! এই চারটেই কি যথেষ্ট নয়!'

এ ধরণের শান্ত মুহূর্তে আমাকে তাঁর হাঁটুর ওপর তিনি বসাতেন, আমার হাতগুলো তুলে নিতেন তাঁর হাতের মধ্যে, থুত্নি দিয়ে চেপে ধরতেন আমার মাথাটা, আর দোলাতে দোলাতে গান গাইতে সুরু করতেন। তাঁর চোখ বিস্ফারিত করে এমন বিষণ্ন স্বরে তিনি গেয়ে চলতেন ক্রমাগত যেটা মনের মধ্যে ফিরে ফিরে আসে। বদলে যেতো তাঁর মুখটা, কেমন ধারা যেন অদ্ভুত হয়ে উঠতো, আর সেই সব সময় তাঁকে আমার ভয় করতো।

শীতকাল সুরু হবার পর আবার প্রতি সকালে মা বাড়ী ছেড়ে যেতেন, ফিরতেন অনেক রাত্রে। সূর্যাস্তের পর দরজায় ছিটকিনি দিয়ে তাঁর জন্যে আমরা অপেক্ষা করতাম। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আমরা বসে থাকতাম, আর ঘরের কোণগুলোর দিকে তাকাতাম না—আমাদের মনে হতো ওখানে প্রায়ই যেন আমরা বিকটাকার দৈত্য দানবদের

দেখতে পাবো। অন্ধ লোকটা আমাদের কুটীরের পাশ দিয়ে বেড়ার ওপর লাঠির আঘাত করতে করতে চলে যাবার পর অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে উঠতো। বেড়ার পাশ দিয়ে রাস্তা খোঁজার জন্যে সর্বদাই সে তার লাঠিটা সামনে নাড়াতো। তারপর, অনেক পরে লোকদের জানালার তলায় মোরগের ডাক ডাকতে ডাকতে মাতাল গাড়ীর মিস্ত্রিটা যেতো চলে। পরস্পর পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে মা ফেরবার অনেক আগেই ঝিমোতে ঝিমোতে আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম। গভীর রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠার পর সর্বদাই তাঁকে মোমবাতির আলোর পাশে বসে মাথা নিচু করে আমাদের জীর্ণ জামাকাপড়গুলো সেলাই করতে কিম্বা ধুতে দেখতাম।

এই সব দিনে যখনই মা ঘরে থাকতেন, মতেয়ুস খুড়ো সর্বদাই আসতো আমাদের বাড়ী। তার বরফে সাদা গোঁফগুলো নাড়াতে নাড়াতে এবং ঠাণ্ডায় অসাড় হাতগুলো ঘষতে ঘষতে সে বিড়বিড় করে বলতো:

'কী করে এখন চালাবো? কী করে চালাতে পারবো! বনের পশুপাখীর মতো আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো।'

আমার বাবার টুপি এবং ভেড়ার লোমের কোটটা সে পরতো আর রবিবার রবিবার নিয়ে যেতো বাবার ক্ষুরটা। সেটা তাকে দিয়ে দিতে মাকে সে রাজি করাতে

পারেনি কারণ মা স্থির করেছিলেন যে সেটা আমাদের মধ্যে কারুর এক জনের প্রাপ্য।

বৃদ্ধ সর্বদাই এমন কিছু না কিছু বলতো যেটাতে মজা লাগতো। কিন্তু সে-ধরণের গল্প সুরু করার জন্যে একটিপ নস্যির প্রয়োজন হতো তার। হলদে একটা বাক্স থেকে নস্যি নিয়ে সশব্দে সে হেঁচে উঠতো।

তারপর কিন্তু এমন এক দিন এলো মতেয়ুস খুড়োর সঙ্গে মা'র আলাপ আলোচনাটা অন্য এক রূপ নিলো— সেটা দীর্ঘ এবং রহস্যময় হয়ে উঠলো। আর দারুণ কৌতূহলী হয়ে ওঠা সত্বেও কিছুতেই আমি তাঁদের ফিস্‌ফিসে কথাবার্তাগুলো বুঝতে পারতাম না। মতেয়ুস খুড়ো বাড়ীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই মা ঘরের সবচেয়ে গরম কোণে তাকে বসতে দিতেন, বাড়ীতে যা থাকতো তাই দিয়েই আপ্যায়ন করতেন তাকে, বসতেন তার পাশে। তাঁকে এ-ধরণের ব্যবহার করতে আগে কখনো দেখিনি। তারপর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বলতেন:

'কী খবর?'

'এখনো সে দোনোমোনো করছে, চুলোয় যাক সে। তোমার বাচ্চাদের জন্যে সে ভয় পাচ্ছে। সে বলছে যে তাদের বাচ্চা-অবস্থায় কোনো ঝামেলা নেই, কিন্তু যখন তারা বড় হয়ে উঠবে…'

আরো কাছে ঘেঁষে বসে মা প্রশ্ন করলেন, 'এরা না থাকলে সে কি রাজি হবে?'

'আমার তো তাই মনে হয়। হ্যাঁ, আমার কোনো সন্দেহ নেই… তাহলে আর কোনো বাধা থাকে না।'

'আর সে কী বল্‌লো?'

'আর কিছু তার বলার নেই। এই রবিবার সে বাড়ী থাকবে না। যেখানে তারা শস্য ঝাড়ছে, জানো তো, সেখানে যন্ত্রটা তাকে চালাতে হবে। সে তো একজন যন্ত্রের মিস্ত্রি।'

'মিস্ত্রি?' মা'র স্বরটা যেন বিস্মিত শোনালো।

'হ্যাঁ, সে মিস্ত্রি! তুমি কি সে কথা জানতে না? অনেকদিন ধরেই সে মিস্ত্রির কাজ করছে। হ্যাঁ, ছোকরাটার বুদ্ধি আছে বটে।'

'ঠিক করে কোনো প্রস্তাব সে করেনি কি?'

'পরের সপ্তাহে সে কথাটা আমি জানতে পারবো। শ্লেম্‌কা'র ওখানে একটা বোতল নিয়ে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করবো। যদি না হয় তাহলে না, যদি হ্যাঁ হয় তাহলে হ্যাঁ-ই হবে।'

মতেয়ুস খুড়োর যাবার সময় মা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

'মতেয়ুস, দয়া করে তোমার যথাসাধ্য করো', তার হাত চাপড়াতে চাপড়াতে তিনি অনুনয় করে বললেন। 'যেমন করে পারো তার মত করিয়ো। তুমি তো জানো আমার নিজের জন্যে বলছি না··· মনে আমার কোনো পাপ নেই, কেবল এই পাঁচটা পেট চালাবার জন্যে ···'

এ-ধরণের রহস্যময় ফিসফিসে কথা, না-বলা কথা, ইঙ্গিত এবং মতেয়ুস খুড়োর অস্পষ্ট এবং অবোধ্য আলোচনা ক্রমশ ঘন ঘন হতে লাগলো।

কয়েকদিন পরেই মতেয়ুস খুড়ো আবার হাজির হলো। হাঁপাচ্ছিলো সে, মুখটা তার লাল এবং মাথার একপাশে টুপিটা ছিল বেঁকা হয়ে।

'হ্যাঁ, এখন তুমি পিঠে ভাজা সুরু করতে পারো', সে ঘোষণা করলো। তার সর্বাঙ্গ টান টান হয়ে উঠেছে। তার গোঁফের ফাঁক দিয়ে এক পরিতৃপ্ত এবং ধূর্ত হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

'তুমি একেবারে নিঃসন্দেহ তো?' যে আলুটার খোসা ছাড়াচ্ছিলেন সেটাকে ফেলে হতভম্ব ভাবে চেয়ার থেকে মা লাফিয়ে উঠলেন। বিস্মিত এবং অপ্রতিভ হওয়া সত্ত্বেও মুখ তাঁর জ্বলজ্বল করছে। এক মিনিট ধরে স্থির হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর অকস্মাৎ আঁচল দিয়ে মুখ

ঢাকলেন তিনি, হাসি চাপতে গিয়ে মেয়েরা যে ভাবে মুখ ঢাকে।

বিজয়ীর ভঙ্গিতে মতেয়ুস খুড়ো বললো, 'ওটাই তোমার কনের ঘোমটা হবে। কথাগুলো কানে যাচ্ছে তো? গভীরভাবে সে চিন্তা করে দেখেছে। বলছিল সে ভয় পাচ্ছে, কথাগুলো কানে যাচ্ছে তো··· দুটো কিম্বা তিনটে হলে ভাবনা ছিল না, কিন্তু তোমার যে পাঁচটা রয়েছে। বলছিল, কথাগুলো কানে যাচ্ছে তো, ওগুলোকে মানুষ করা কঠিন হবে। অবশেষে আর একটা বোতল আমরা খুললাম, কথাগুলো কানে যাচ্ছে তো, আর সে বল্‌লো: 'ঠিক আছে, যাই হোক না কেন—আমি রাজি।'

মা কিন্তু আর শুনছিলেন না। বেঞ্চিটার ওপর ধীরে ধীরে বসে পড়ে বুকের ওপর মাথা ঠেকিয়ে তিনি কাঁদতে স্নুরু করলেন।

'কাঁদছো কেন কাঁদছো কেন। রু পাতাটার * জন্যে কাঁদছো নাকি? আমার পরিশ্রমের জন্যে 'মেরিকানটাকে' এবার আমায় দাও।'

---

* রু পাতা—লিথুয়ানিয়ার লোক-কথা অনুসারে কুমারীত্বের প্রতীক।

আমার বাবার যে ভাই আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে তিনি যে ক্ষুরটা পেয়েছিলেন, মতেয়ুস খুড়ো সেটার নাম দিয়েছিলো, 'মেরিকান'। এই সামান্য জিনিসটা বৃদ্ধকে তখনো শান্তি দিচ্ছিল না।

লজ্জিত হয়ে মা কান্না থামালেন। চোখ মুছে, চুলগুলো ঠিক করে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে সংযত স্বরে তিনি বললেন:

'ওদের জন্যেই আমার যা দুঃখ··· যে ভাবেই দেখ না কেন অপরিচিত—অপরিচিতই থেকে যায়। বাপের মতো কখনোই ওদের সে আলিঙ্গন করবে না, আদর করবে না··· একেবারে নিষ্কলুষ তার অন্তঃকরণ হলেও পিতার স্নেহ কখনো সে তাদের দিতে পারবে না।'

এবার ক্ষুরটাকে মতেয়ুস খুড়ো একেবারে নিয়ে গেলো—কারণ দেবার সময় মা তাকে বললেন:

'এই নাও মতেয়ুস। আশা করি তোমার স্পর্শটা শুভ। নতুন আর কোনো দুশ্চিন্তা আমি চাই না।'

* * *

একরাত্রে ঘুম থেকে উঠে আগুনের ধারে মা আর একজন অপরিচিত লোককে দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। আগুনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটা বেঞ্চির

ওপর তাঁরা বসেছিলেন, পরস্পর পরস্পরকে প্রায় জড়িয়ে ধরে। কোনো মুহূর্তে তাঁদের চিন্তিত মুখগুলো আলোকিত হয়ে উঠছিল, কোনো মুহূর্তে বা দেয়ালের আগুনের লাল আভা জ্বলজ্বল করছিল।

আগুনটা নিভে আসার সময় মাঝেমাঝে কোণ থেকে বেরিয়ে আসছিল ছায়াগুলো, আর মনে হচ্ছিল বুঝি তাঁদের মাথা দুটো এক হয়ে মিশে গেছে। কিন্তু আগুনের শিখাগুলো যখন লাফিয়ে উঠছিল, তাঁদের মাথাগুলো যাচ্ছিল পৃথক হয়ে। লোকটার চোখদুটো গভীর, মুখটা কামানো আর লম্বাটে ধরণের। ইতিপূর্বে কখনো তাকে আমি দেখিনি। তার বড় বড় থাবাগুলো আলগোছে জড়িয়ে হাঁটু দুটোর মধ্যে ঢোকানো। অবশেষে আগুন থেকে চোখ না তুলে বিব্রত স্বরে সে বল্‌লো:

'সব কিছু আমরা ঠিক-ঠাক করে তুলবো; সবকিছু খাপ খাইয়ে নেবো এবং যেমন করেই হোক অভাব ঘোচাবো…'

অপরিচিত লোকটির আরো কাছ ঘেঁষে মা বসলেন এবং তার হাতে আর হাঁটুতে হাত বোলাতে বোলাতে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার কাঁধের ওপর নিজের মাথাটা রাখলেন।

'মা — মা!'

আমার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উন্মত্তভাবে কেন এই যে ঐ কান্না ফেটে বেরুলো সে কথা আমি জানি না।

সেটা বেদনায় কিম্বা না-বোঝা লজ্জায় হিংসেয় আমার বুকটা যেন চেপে ধরলো।

'কী হয়েছে রে, সোনা আমার?' উঠে পড়ে মা আমাকে কোলে তুলে নিলেন। 'আমার বুকে চলে আয় সোনা মানিক, কী স্বপ্ন তুই দেখছিলি?'

একটা দুর্বল মুরগিছানার মত আমাকে তুলে নিয়ে উনুনটার পাশে আমাকে দাঁড় করানো হলো। অপরিচিত লোকটির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো আমার। কুৎসিত তার চেহারা, মুখে বসন্তের দাগ।

আমাকে সামনে ঠেলে মা বললেন, 'ইয়নুকাস, জিগ্‌গেস কর উনি কেমন আছেন! এই তোর বাবা। তিনি তোর প্রতি সদয় হবেন এবং ভালোবাসবেন তোকে...'

কথাগুলো শুনে মা'র হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে দৌড়ে ফিরে গেলাম আমি। কান্নায় আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল। আমার অন্যান্য ভাইরাও ইতিমধ্যে জেগে উঠে অপরিচিত লোকটির দিকে তাকিয়েছিল। তাদের কাছে ফিরে যেতে যেতে নিজেকে আমার ভারি ছোট আর অসহায় বলে মনে হলো—মনে হলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে একলা আমি। এবং আজকে আগুনের পাশে বসে এই সব কথা মনে করছি কেন তা আমি জানি না।

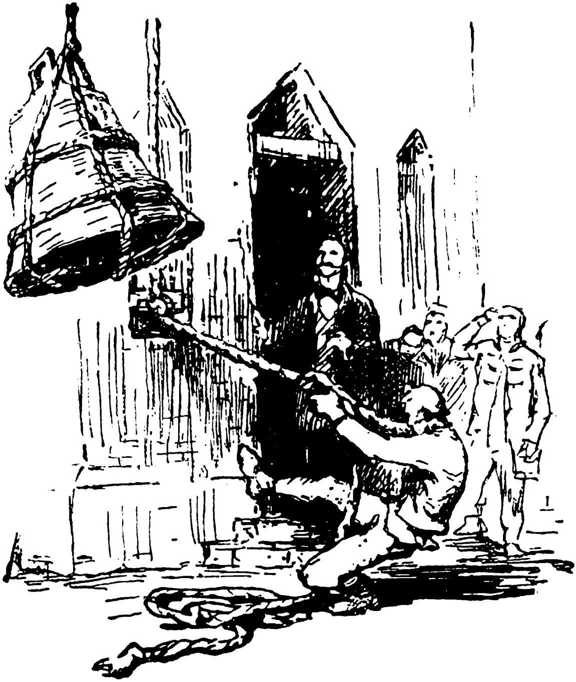

অতীতের একটি পৃষ্ঠা

আমি কখনো ভাবিনি যে সে আমার মা'য়ের অথবা বাবার দিক দিয়ে আত্মীয়, কিম্বা শুধুই একজন আশ্রিত লোক। বাড়ীতে এ-বিষয়ে কখনোই আমরা আলোচনা

করতাম না। কিন্তু তার সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করা হতো তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে সে আমাদের বদন্যতার জন্যেই এই সংসারে রয়েছে। ছেলের দল আমরা তাকে ডাকতাম বাতিয়া কিম্বা বাতেঙ্কা বলে—প্রতিবেশীরা কিন্তু তাকে ডাকতো কাতিনাশ বলে। যখন আমি বাচ্চা ছিলাম তখন ভাবতাম যে পৃথিবীর মধ্যে সেই সবচেয়ে বুড়ো লোক। কখনোই সে তার ভেড়ার চামড়ার কোট ছাড়তো না বলে মনে হতো কী গ্রীষ্ম, কী শীত সর্বদাই তার সমান শীত করে। শরৎকালের সুরু থেকে 'সেণ্ট ইয়োনাস'এর দিন' পর্যন্ত উনুনের পাশের ছোট বিছানাটায় সে শীত কাটাতো। স্মরণ এবং দৃষ্টিশক্তি একেবারেই প্রায় সে খুইয়েছিল। প্রতিবেশীদের গলার স্বর শুনে সে তাদের চিনতে পারতো। প্রায়ই ভুল হতো তার।

'য়ুর্গিস কালনিয়ুস নাকি?' উনুনটার কাছ থেকে অতিথির গলার স্বর শুনে সে চেঁচিয়ে উঠতো।

মা কিম্বা বাবা বলতেন, 'ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। অনেকদিন আগেই য়ুর্গিসকে গোর দেওয়া হয়েছে। শবযাত্রায় তুমিও যে ছিলে সেকথাটা কি মনে নেই? এতো স্তেপাস, রুবিয়াই'এর কামার।'

'বেচারা কালনিয়ুস, শক্তিশালী কালনিয়ুস আর আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই', সখেদে বৃদ্ধ বিলাপ করে উঠতো। ঠোঁটটা নাড়িয়ে তার স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়াতে সুরু করতো—যেটা বাস্তবিকই তার বন্ধু এবং সহকর্মীদের গোরস্থানে পরিণত হয়েছিল।

কিন্তু তার একটা ক্ষমতায় সবাই আমরা বিস্মিত হতাম। বৃদ্ধের শ্রবণ-শক্তি ছিল আশ্চর্য রকম প্রখর। সর্বদাই সবরকম শব্দ সে শুনতে পেতো—পরিষ্কার আকাশে বজ্র হাঁকছে, গুলি গোলার শব্দ, কিম্বা সাহায্যের জন্য আর্তনাদ।

মাঝে মাঝে তার ছোট বিছানায় উঠে বসে, নিজের বুকে ক্রশ চিহ্ন এঁকে সে বলতো:

'সবাই যেন তার স্মৃতি মনে রাখে। ঐ আরেকটা শেষ-কৃত্যের উপাসনা করছে ওরা। আমিই কেবল একমাত্র যাকে ঈশ্বর ভুলে গেছেন ...'

ঘরের লোকেরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে বাইরে চলে যেতো যেখানে কিছুই দেখা কিম্বা শোনা যায় না তবু এক ঘণ্টা পরে আমাদের জানালার পাশ দিয়ে একটা কফিন লোকেরা বয়ে নিয়ে যেতো।

মা বলতেন বৃদ্ধের এই ক্ষমতাটা ঈশ্বর-দত্ত। কিন্তু আমরা, বাচ্চারা, এটাকে আশ্চর্য এবং ভয়াবহ বলে মনে করতাম। রাত্রে বাতিয়া জেগে উঠে বলতো কাকে যেন সে আমাদের উঠনে কিম্বা চিলে কুটরীতে পা ঘষটে হাঁটতে শুনছে।

গ্রামের বাইরে উঁচু একটা পাহাড়ে ছিল একটা পরিত্যক্ত কবরস্থান—দুর্ভিক্ষ এবং মহামারির সময় থেকে সেটা পরিত্যক্ত হয়েছিল। সেটা আগাছায় ভরা এবং নির্জন বলে প্রায়ই সেখানে ছেলের দল এবং পাখীরা যেতো। শরৎকালের প্রথম পাতলা বরফ পড়ার পর পুরোনো কবরের গায়ে ঘন হয়ে জন্মানো ব্ল্যাকবেরি খাবার লোভে তারা সেখানে যেতো। সেই পরিত্যক্ত গোরস্থানে বৃদ্ধ কাতিনাস'কেই সব শেষে কবর দেওয়া হয়। লড়াই থেকে একটা গাড়ীতে করে যখন সে পালাচ্ছিল তখনই হয় তার মৃত্যু।

এতো বছর কেটে গেছে যে তাকে যে কি রকম দেখতে ছিল সেটা আমি ভুলে গেছি। আমার নিজের গ্রামে হালে যখন বেড়াতে গিয়েছিলাম, তাঁর পুরোনো তাঁতটাকে প্রশংসা করতে করতে মা আমায় দেখালেন। আগেকার মতই সেটা ঘরের কোণে ছিল।

'কাতিনাসের কাজের ওটা একটা নিদর্শন। আজকাল আর কাউকে খুঁজে পাবি না যে ওরকম হালকা আর কাজের একটা তাঁত তৈরী করতে পারে।'

এবার আমি ভাবলাম আমার কৌতূহলটা মেটাবো। মাকে জিগ্‌গেস করলাম বাতেঙ্কার কথা, যার মুখটা অকস্মাৎ আমার চোখে ভেসে উঠলো।

'সেকি আমাদের কোন আত্মীয় ছিল?'

'হ্যাঁ আর না—দুই-ই', মা তাঁর গল্প সুরু করলেন। 'এ অঞ্চলে প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের সম্পর্ক আছে; লোকেরা বলে একই পূর্ব পুরুষ থেকে আমাদের উদ্ভব। প্রথমে এখানে দুটি কুটীর এবং এক গভীর অরণ্য ছাড়া আর কিছু ছিল না। চারিদিকে ছিল দুর্গম বন জঙ্গল। এখন অবশ্য এখানে অনেকগুলো কুটীর রয়েছে। তোর বাবার পরিবার কাতিনাসকে আশ্রয় দিয়েছিল। যখন তোর বাবাকে আমি বিয়ে করি, ইতিমধ্যেই তখন কাতিনাস তার বিছানাটায় আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তার আগে সমস্ত পৃথিবীটা সে চক্কর দিয়েছিল কাঁধে একটা ঝুলি আর হাতে একটা লাঠি নিয়ে। তোর বাবার আত্মীয়দের ওর ওপর করুণা হয়েছিল। সে কিন্তু কারো গলগ্রহ হয়ে থাকতো না, কিম্বা কখনই থাকতো না অলস হয়ে। উনুনটার পিছনে

সামান্য ছুতোরের কাজ সে সুরু করেছিল। ঐ প্লেট রাখবার তাক, তাঁত আর চ্যাপটা ব্যাটের দিকে চেয়ে দ্যাখ—বৃদ্ধ সবগুলোই বানিয়েছিল। যতদিন তার শরীরে শক্তি ছিল সে কাঠ চেলা করতো আর সেগুলোকে মস্থণ করতো, আর বাড়ীটা ভরে তুলতো তার হাতের কাজে। তার হাতে যখন সামান্য সময় থাকতো প্রতিবেশীদের জন্যে নানা রকম জিনিস তৈরী করতো সে। যে টাকা সে রোজগার করতো সেটা কখনই সে জমাতো না—তার ভরণ পোষণের জন্যে সবটাই সে দিয়ে দিতো। কখনোই সে ধূম্রপান কিম্বা মদ্যপান করতো না। এই জন্য সে এতো বয়েস অবধি বেঁচে থাকতে পেরেছে। সে জানতো না কত তার বয়েস। সর্বদাই তাকে আমার মনে পড়ে পাকা চুল নিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে। কিন্তু তার শ্রবণ শক্তি এতো অদ্ভুত প্রখর ছিল যে বাস্তবিক আমি ভাবতাম ফুলগুলো ফোটার শব্দ পর্যন্ত সে শুনতে পেতো।

'অনেক অনেক দিন আগে, ভদ্রলোকেরা যখন সরল মানুষদের হর্তাকর্তা বিধাতা ছিল, তখন সে ছিল আমাদের জমিদার পাসলাউসকাস'এর ক্রীতদাস। দারুণ ক্ষমতাবান লোক ছিল সে—এমন শক্তিশালী ছিল যে তার জুড়ি কাছাকাছি কেউ ছিল না। অনায়াসেই সে তিন বছরের

একটা ঘোড়াকে পিঠে তুলে নিতে পারতো। দশটা লোক মিলে যে কাজ করতে পারে না একাই সে কাজ সে করতে পারতো। এ-কারণেই মনে হয় কাউণ্ট পাসলাউসকাস কাতিনাসকে সামান্য ভয় পেতেন, যদিও তখন ক্রীতদাসদের তাঁর আস্তাবলে এনে বেত মারা হতো। এই হারকিউলিস'এর মতো শক্তিশালী লোকটার প্রতি তাঁর কোনো টান ছিল না। তাকে দিয়ে সর্বদাই তিনি ভারি ভারি কাজ করাতেন। মাঝে মাঝে কাতিনাসকে কাজ করতে তিনি দেখতেন, দেখতেন তাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে সেটা সে অনায়াসে করে চলেছে, আর নিজের মনেই বলতেন: 'বাস্তবিকই শক্তিশালী এই ক্রীতদাসটা।' আমি জানি না কেন, কিন্তু কিছুদিন পর থেকে কাতিনাস'এর পিছনে লাগতে লাগলেন তার প্রভু। তাকে এ-জিনিসটা আনতে ও-জিনিসটা তুলতে বাধ্য করতেন তিনি আর লক্ষ্য রাখতেন পাঁচজন লোক যেটা বইতে না পারে সেটা যেন তাকে বইতে হয়। এবং সর্বদাই বলতেন, 'লোকটা বাস্তবিকই শক্তিশালী, এই ক্রীতদাসটা'...

'একদিন কাউণ্ট স্থির করলেন যে তাঁর জমিদারিতে একটা গির্জা তৈরী করবেন। ক্রাকোভ থেকে আনালেন একটা ঘণ্টা। পাথরের কাজের ওস্তাদ কারিগরদের ঘণ্টাটা

বসাবার জন্যে ডাকা হলো আর কয়েকজন ক্রীতদাসকে বলা হলো তারা যেন কারিগরদের সাহায্য করে। দড়িটা ধরে তারা যখন ঘণ্টাটা তুলবো তুলবো করছে কাউণ্ট তখন তাদের থামিয়ে বললেন; 'সেই যোয়ান ক্রীতদাসটা কোথায়?' কাতিনাসকে ডেকে তিনি হুকুম দিলেন একলা ঘণ্টাটা তুলতে। যেটা টানতে দশটা যোয়ান লোকেরও কষ্ট হয়, কাতিনাস একাই দড়ি ধরে সেটা টানতে লাগলো, আর আকাশে যেরকম অনায়াসে লার্ক পাখী উড়ে যায় ঘণ্টাটা মাটি থেকে ঘণ্টাঘরের উপর সেই রকম অনায়াসেই গেল উঠে। সেই দিন থেকে কাতিনাস'এর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো··· হারালো সে তার শারীরিক শক্তি; তার দিকে তাকিয়ে কেউ ধারণাই করতে পারতো না একদিন গায়ে তার অত জোর ছিল। কাউণ্ট দেখলেন যে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে আর তাই তিনি কাতিনাসকে শান্তিতে থাকতে দিলেন। অন্যদের ওপর যেরকম তিনি বেত চালাতেন কাতিনাস'এর ওপর, তার দোষ থাকুক বা না থাকুক, সেভাবে বেত চালাতে এখন আর তিনি ভয় পেতেন না···

'কাতিনাস সেখানেই বুড়ো হয়ে গেলো, আর যখন তার বয়েস হলো পঞ্চাশ, অকস্মাৎ তার প্রভু তার বিয়ে দেবেন ঠিক করলেন। জমিদারিতে আগোটা নামে একটি

ঝি তখন কাজ করতো। তার বয়েস ছিল অল্প আর তাকে দেখতেও ছিল গোলগাল। কারণটা আমি বলতে পারবো না—হয়তো কাউণ্ট তাকে অপছন্দ করতেন, কিম্বা হয়তো তাঁদের মধ্যে কিছু একটা ঘটেছিল—কিন্তু ব্যাপারটা হলো এই যে কাউণ্ট তাকে ডেকে বললেন;

'কাতিনাসকে বিয়ে করতে চাস?'

'না', মেয়েটি উত্তর দিলো।

'কেন নয়?'

'ও তো বুড়ো', মেয়েটি বল্‌লো।

'ইতিমধ্যেই অন্য লোকের সঙ্গে আগোটা প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু সে কথা তার প্রভুকে জানালে হয়তো তার প্রেমিককে খাটিয়ে তিনি মেরে ফেলবেন—এই ভয় সে করছিল। কাউণ্ট রেগে উঠে মেয়েটিকে আদেশ দিলেন এক রাতের মধ্যে পাঁচ মন গম পিষতে। আগোটা আদেশ পালন করলো। তার উচিত মতন শিক্ষা হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে পরের দিন কাউণ্ট এলেন। তার কাজে খুঁত বার করে লাঠি দিয়ে তাকে দু'ঘা কষালেন। নায়েবও তাকে তিন ঘা মারলো। বেত মারতে মারতে তাকে সে প্রশ্ন করলো:

'কাতিনাসকে বিয়ে করতে রাজি, হারামজাদি?'

'সহজে কিন্তু আগোটাকে ভয় পাওয়ানো গেল না।

'কাতিনাসকে বিয়ে করার চেয়ে এক রাতে আমি কুড়িটা টাক্‌লি ভরা সূতো কাটতে রাজি আছি।'

'ভালো কথা, সূতো কাট তাহলে।'

'পরের দিন সকালে প্রভূ এবং নায়েব এলেন দেখতে কি রকম সূতো সে কেটেছে। কাউণ্ট তার আঙুল থেকে আংটি খুলে তার ভেতর দিয়ে সূতোটা টেনে পরখ করে দেখতে গেলেন। কিন্তু দেখা গেল সেটা অতিশয় মোটা। কাউণ্ট তাকে আবার দু'ঘা এবং নায়েব তিন'ঘা আঘাত করলেন।

'আমি মামলা করবো', তার ক্ষত স্থানের উপর হাত বোলাতে বোলাতে মেয়েটি বললো। 'একটা বুড়ো লোকের সঙ্গে আমায় তুমি যে বিয়ে দিতে চাও, এটা ভারি অন্যায়, কর্তা। স্বয়ং জারের কাছে আমি যাবো।'

'যা, যা,' কাউণ্ট বললেন।

'কিন্তু আগোটা চলে যাবার পরেই তার পেছনে পেছনে নায়েবকে পাঠালেন কাউণ্ট। সে তাকে ফিরিয়ে আবার বাড়ীতে নিয়ে এলো। কাউণ্ট ব্রায়ার গাছের ছপ্‌টি আনালেন। নায়েব নিজেই সেগুলো নিয়ে এলো আর আগোটাকে শোয়ালো বিছানার ওপর, আর বেত চালিয়ে চললো যতক্ষণ

না রক্ত বেরোয়। তাকে যখন আদেশ করা হলো উঠে দাঁড়াতে অন্যের সাহায্য না নিয়ে সে উঠে দাঁড়াতে পারলো না। তাকে দাঁড়াতে তাঁদের সাহায্য করতে হলো।

প্রভু প্রশ্ন করলেন, 'কেমন, কাতিনাসকে এখন বিয়ে করতে রাজি হয়েছিস তো?'

যন্ত্রণায় আগোটার মতিভ্রম হয়েছিল, সে উত্তর দিল:

'আপনাদের যা ইচ্ছে।'

'কর্তা ততক্ষণাৎ ঘোড়া-জুততে বলে পুরোহিতকে আনবার জন্যে গাড়ী পাঠালেন। স্বয়ং হাজির হলেন পুরোহিত। মেয়েটি ক্ষত স্থান থেকে রক্ত ধোবার আগেই কাতিনাস'এর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলেন তিনি। সেইদিনই মুক্তি দিয়ে দেওয়া হলো তাদের আর বলা হলো যেখানে খুসী তারা যেন চলে যায়।

'বেত মারার দিন থেকে আগোটার সৌন্দর্য মিলিয়ে আসতে লাগলো। দেখতে দেখতে সে কালা হয়ে গেল আর অল্প সময়ের মধ্যেই হারালো দৃষ্টিশক্তি। গ্রামের বাইরে কাতিনাস তাকে হাত ধরে নিয়ে যেতো। যখন কাজ পেতো তখন কাজ করতো সে, এবং বাকি সময় বেড়াতো ভিক্ষে করে। সর্বদাই তার সঙ্গে থাকতো একটি প্রার্থনার বই। পড়তে সে পারতো না, কিন্তু প্রার্থনাগুলি ছিল তার মুখস্থ

আর সে জানতো কোন কোন পাতায় সেগুলো ছাপা আছে। প্রার্থনা করতে সে সুরু করতো আর আগোটাও তার সঙ্গে বলতো: 'তুমি, আমাদের পাপীদের জন্য উপসনা কর! ...' একদিন কাতিনাস তার স্ত্রীকে একটি বেঞ্চিতে বসিয়ে তার পাশে নিজে বসতে গিয়ে বললো: 'একটু সরে বসো তো।' কালা মেয়েটা ভাবলো সে বুঝি প্রার্থনা করতে সুরু করেছে; তাই সে গেয়ে উঠলো: 'তুমি, আমাদের পাপীদের জন্য উপসনা কর! ...'

'দশ বছর এ-ভাবে কেটে গেল। ক্রমশ শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে গিয়ে আগোটা মারা গেল, তখনও সে তরুণী।

'জমিদারিতে কাউণ্টের কাছে এসে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য কাতিনাস সামান্য অর্থ চাইলো।

'কাউণ্ট বল্‌লেন, 'জানিস তো, তুই বুড়ো বলে তোকে সে বিয়ে করতে চায়নি, কিন্তু দ্যাখ সে মরবার পরেও তুই বেঁচে আছিস...' এই বলে কফিনের জন্য তিনি পাঁচ রুবল দিলেন।

'তারপর অনেকদিন ধরে কাতিনাস নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অবশেষে তোর বাবা তাকে বাড়ীতে নিয়ে এলো। লোকটা বুড়ো বলে করুণা হয়েছিল তার। আগেকার সেই শক্তি তার আর ছিল না আর তখন

কোনো পরিশ্রমের কাজ সে করতে পারতো না, কিন্তু অনেক বয়েস পর্যন্ত সে বেঁচেছিল। সে নিজেই বলতে পারতো না কত বয়েস তার হয়েছে। আমার যতদূর মনে পড়ে সর্বদাই তাকে পাকা চুল আর থুথুড়ে অবস্থায় দেখেছি… ক্রাচ ছাড়া এক পাও সে হাঁটতে পারতো না, কিন্তু শ্রবণ শক্তি তার এমন আশ্চর্য প্রখর ছিল যে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ সে ফুলগুলো ফোটার শব্দও শুনতে পেতো।'

ПЕТРАС ЦВИРКА

СЕМЕНА БРАТСТВА